বেজি

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

সূচি

নিশির জন্যে ভালোবাসা / ৩
নিউরাল কম্পিউটার / ১৩
একটি মৃত্যুদণ্ড / ২৫
স্ক্রিন সেভার / ২৯
চিড়িয়াখানা / ৪৫
বেজি / ৫৫

নিশির জন্যে ভালোবাসা

বাল্টিমোরের কনভেনশন সেন্টারে এইমাত্র আলবার্তো গার্সিয়া তার পেপারটি উপস্থাপন শেষ করেছেন। ওভারহেড প্রোজেক্টরের সুইসটি অফ করে তিনি হলভর্তি দর্শকদের দিকে তাকালেন। বিজ্ঞানীদের কনফারেন্সে বক্তব্য শেষ হবার পর সাধারণত ছোট একটি সৌজন্যমূলক করতালি দেয়া হয় কিন্তু এবারে একটি বিস্ময়কর নীরবতা বিরাজ করল। এই সেশনটির সভাপতি সেন্ট জন বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃদ্ধ অধ্যাপক বব রিকার্ডো প্রথমে করতালি দিতে শুরু করলেন এবং গ্যালারীর প্রায় দুই হাজার শ্রোতা হঠাৎ করে চেতনা ফিরে পেয়ে করতালিতে যোগ দিল। দেখতে দেখতে করতালির প্রচণ্ড শব্দে হলঘরটি ফেটে যাবার উপক্রম হল কিন্তু তবুও সেটি থেমে যাবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, বরং একজন-দু'জন করে সবাই দাঁড়িয়ে গিয়ে উরুগুয়ের একটি অখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের অখ্যাত বিজ্ঞানীকে সম্মান দেখাতে শুরু করলেন। বিজ্ঞানীদের কনফারেন্সে সাধারণত সাংবাদিকরা থাকেন না কিন্তু জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারদের এই বার্ষিক কনফারেন্সে আলবার্তো গার্সিয়া যে পেপারটি উপস্থাপন করবেন তার কথা কিভাবে জানি বাইরে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল, কাজেই আজ এখানে হলভর্তি সাংবাদিক। ফটো তোলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সাংবাদিকদের ক্যামেরা ফ্ল্যাশ জ্বলতে শুরু করল, এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি ধরে রাখার জন্যে শ্রোতাদের অনেকে তাদের ক্যামেরা বের করে ছবি তুলতে শুরু করলেন।

বৃদ্ধ অধ্যাপক বব রিকার্ডো শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়ালেন, তাকে নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে সেশনটি শেষ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যদি এখনই তিনি নিয়ন্ত্রণটুকু হাতে না নিয়ে নেন সেটি সম্ভব হবার কথা নয়। বব রিকার্ডোকে উঠে দাঁড়াতে দেখে শ্রোতারা তাদের করতালি থামিয়ে একজন একজন করে নিজের চেয়ারে বসে পড়লেন, সাংবাদিকদের দলটি ঠেলাঠেলি করে আরো সামনে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। বব রিকার্ডো কি বলেন শোনার জন্যে সবাই নীরব হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

বব রিকার্ডো উপস্থিত শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে একটি নিশ্বাস ফেলে কোমল গলায় বললেন, "আলবার্তো গার্সিয়ার নাম আমাদের মতো কয়েকজন ছাড়া কেউ জানত না। কিন্তু আজ থেকে পৃথিবীর সব মানুষ আলবার্তোর কথা জানবে। আজকের কনফারেন্সে সে যে পেপারটি উপস্থাপন করেছে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে সেটি অত্যন্ত সাদামাটা একটি টেকনিক্যাল

পেপার, কোষ-বিভাজনের সময় মানব-ক্রমোজমের টেলোমিয়ারকে অক্ষত রাখার প্রক্রিয়া। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলেই দেখা যাবে সে শুধু টেলোমিয়ারকে অক্ষত রাখেনি, টেলোমারেজ প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করেছে এবং সফলভাবে মানবকোষে ব্যবহার করেছে। আমরা তার তথ্য থেকে জানতে পেরেছি আলবার্তোর সাদাসিধে একটি ল্যাবরেটরিতে একটি পেটরি-ডিশে মানবদেহের ত্বকের কয়েকটি কোষ বিভাজন করছে যাদের থেমে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।"

বব রিকার্ডো বার্ধক্যে শীর্ণ হয়ে যাওয়া তার হাতটি সামনে তুলে ধরে বললেন, "আমাকে বার্ধক্য এবং জরা আক্রান্ত করেছে, কারণ প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী আমার দেহের কোষগুলো তাদের হিসেবমত একশ থেকে দুশবারের মতো বিভাজন করে থেমে পড়েছে। মঞ্চে দাঁড়ানো আলবার্তো বলছে থেমে পড়ার প্রয়োজন নেই। আলবার্তো গার্সিয়া মানবজাতির পক্ষ থেকে সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি খুঁজে বের করেছে। সে আজ আপনাদের সামনে ঘোষণা করেছে মানুষকে বার্ধক্য স্পর্শ করবে না।" বব রিকার্ডো হঠাৎ থেমে গেলেন, কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে বললেন, "প্রকৃতপক্ষে আলবার্তো মানুষকে অমরত্ব দান করেছে।"

হলঘরটিতে হঠাৎ এক ধরনের চাঞ্চল্য দেখা গেল, একসাথে অনেকে কথা বলতে শুরু করল, অনেকে প্রশ্ন করার জন্যে উঠে দাঁড়াল। বব রিকার্ডো হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আমি জানি আপনাদের সবার ভিতরে অসংখ্য প্রশ্ন জমা হয়েছে, আমার নিজের ভিতরেও আছে। কিন্তু আজকে আমাদের হাতে সময় নেই, আমি এখানে মাত্র অল্প দু-একটি প্রশ্ন গ্রহণ করতে পারব। কে প্রশ্ন করতে চান ?"

উপস্থিত বিজ্ঞানীদের অনেকেই হাত তুলে প্রায় দাঁড়িয়ে গেলেন, বব রিকার্ডো তাদের একজনকে সুযোগ দেয়ার জন্যে উঙ্গিত করছিলেন কিন্তু তার আগেই কমবয়সী একজন তরুণী হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল, অনুমতির অপেক্ষা না করেই বলল, "প্রফেসর রিকার্ডো - আমরা সংবাদপত্র থেকে এসেছি, আপনাদের বৈজ্ঞানিক আলোচনা আমরা কিছুই বুঝব না। সেটি কি পরে করা যায় না ? আপাতত আমাদের কৌতুহল মেটানোর জন্যে কি একটি-দুটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না ?"

বব রিকার্ডো একটু হাসার চেষ্টা করে বললেন, "কি প্রশ্ন ?"

তরুণীটি আরো একটু এগিয়ে এসে বলল, "আমি ডক্টর গার্সিয়ার কাছে জানতে চাই তিনি কেন এই আবিষ্কারটি করেছেন ?"

আলবার্তো গার্সিয়াকে একটু বিভ্রান্ত দেখা গেল, তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তরুণী সাংবাদিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, “কেন ?“

“হ্যাঁ, কেন ?“

আলবার্তো গার্সিয়া একটু বিপন্ন মুখে বললেন, “টেলোমারেজ নিয়ে আমার অনেকদিনের কৌতুহল। আমাদের ল্যাবরেটরিতে সেরকম সুযোগ-সুবিধে নেই, তাই যেটুকু পেরেছি সেটুকুই করেছি। মানবকোষকে কিভাবে অনির্দিষ্ট সময় বিভাজন করতে দেয়া যায় সেটি বিজ্ঞানীমহলের দীর্ঘদিনের কৌতুহল। আমি সেই কৌতুহল থেকে কাজ করেছি-“

“কিন্তু মানুষ যদি অমর হয়ে যায় - তাদের যদি মৃত্যু না হয় -“

আলবার্তো গার্সিয়া হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, “আমি একজন বিজ্ঞানী, আমি শুধু বিজ্ঞানের কৌতুহল নিয়ে কাজ করেছি। এই তথ্যের কারণে মানবসমাজে কি প্রভাব পড়বে সে-সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।“

তরুণী সাংবাদিক উৎকণ্ঠিত মুখে বলল, “কিন্তু এখন আমরা সেটাই শুনতে চাই। মানুষ যদি অমর হয়ে যায় এই পৃথিবীর কি হবে ? সমাজের কি হবে ?“

আলবার্তো গার্সিয়া মাথা নাড়লেন, বললেন, “আমি জানি না।“ একমুহূর্ত চুপ করে থেকে তিনি বব রিকার্ডোর দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, “হয়তো প্রফেসর রিকার্ডো এ ব্যাপারে আপনাদের কিছু-একটা বলতে পারবেন।“

সাংবাদিকরা সাথে সাথে বব রিকার্ডোর দিকে ঘুরে গেল, “প্রফেসর রিকার্ডো, আপনি কি কিছু বলবেন ?“

বব রিকার্ডো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, “ভবিষ্যত অনুমান করা খুব কঠিন, কিন্তু তোমরা যদি আমাকে চাপ দাও আমি চেষ্টা করতে পারি।“

“আমরা চাপ দিচ্ছি প্রফেসর রিকার্ডো।“

বব রিকার্ডো একটু হেসে কথা বলতে শুরু করলেন, কথা শুরু করার সাথে সাথে তার মুখের হাসি মিলিয়ে সেখানে একটি থমথমে গাম্ভীর্য চলে এল। প্রায় নীচুগলায় বললেন, “মানুষের অমরত্বের জন্যে মোহ দীর্ঘদিনের। এই অমরত্বের লোভে সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে অনেক অন্যায় অনেক পাপ করা হয়েছে। দেবদেবী বা ঈশ্বর মানুষকে যে-অমরত্ব দিতে পারেনি, আমাদের বিজ্ঞানীরা মানুষকে সেই অমরত্ব দেয়ার আয়োজন সম্পন্ন করেছে। এখনও

সেই কাজ পূর্ণ হয়নি কিন্তু আমার হিসেবে আগামী শতাব্দী থেকে মানুষ আর বার্ধক্যের কারণে মৃত্যুবরণ করবে না।“

বব রিকার্ডোকে বাধা দিয়ে একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করল, “তাহলে কিসে তাদের মৃত্যু হবে ?“

“রোগ, শোক, একসিডেন্ট, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, হত্যাকাণ্ড। কিন্তু পৃথিবীর হিসেবে সেটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। মানুষের যদি মৃত্যু না হয়, দেখতে দেখতে এই পৃথিবীতে জনসংখ্যার এক ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটবে। এই পৃথিবীতে থাকবে শুধু মানুষ আর মানুষ। আজ থেকে হাজার বছর পর এই পৃথিবীতে পদচারণা করবে সহস্র বছরের যুবা, তাদের চোখে কী থাকবে - স্বপ্ন না হতাশা আমি জানি না, তাদের বুকে কী থাকবে, ভালোবাসা না ঘৃণা সেটাও আমি জানি না। আমার বয়স সত্তুর, আমি এখনো আমার শৈশবকে স্মরণ করতে পারি, সহস্র বছরের মানুষ কি তার শৈশবকে স্মরণ করতে পারবে ? আমার মনে হয় পারবে না। তাদের স্মৃতিতে কোনো আনন্দ নেই, তাদের সামনে ভবিষ্যত নেই, কোনো স্বপ্ন নেই। বেঁচে থাকার কোনো তাড়না নেই। তাদের সমাজে কোনো শিশু নেই, কোনো ভালোবাসা নেই - তাদের কথা চিন্তা করে আমি শিউরে উঠছি।“

একজন পৌঢ় সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন, “তাহলে আপনি কি মনে করেন ড. আলবার্তো গার্সিয়াকে পৃথিবীর ইতিহাস ভালোভাবে স্মরণ করবে না ?“

বব রিকার্ডো বিষণ্নমুখে মাথা নেড়ে আলবার্তো গার্সিয়ার দিকে তাকালেন, বললেন, “আমি দুঃখিত আলবার্তো। কিন্তু আমার ধারণা মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করার জন্যে পৃথিবীর ইতিহাস এককভাবে তোমাকে দায়ী করবে। তুমি হবে পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অভিশপ্ত বিজ্ঞানী।“

আলবার্তো গার্সিয়া ফ্যাকাশে মুখে বব রিকার্ডোর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

দুই হাজার বছর পরের কথা।

নিশি রনের গলা জড়িয়ে বলল, “তুমি এরকম মুখ ভার করে আছ কেন ?“

রন অন্যমনস্কভাবে নিশির হাত সরিয়ে বলল, “কে বলেছে আমি মুখ ভার করে আছি ?“

“এই তো আমি দেখছি, তুমি নিজ থেকে কোন কথা বলছ না, আমি কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিচ্ছ। তাও ছাড়া-ছাড়া ভাবে, কাটা-কাটা ভাবে।“

রন নিশিকে নিজের কাছে টেনে এনে বলল, “আমি দুঃখিত নিশি। কয়দিন থেকে কেমন যেন অস্থির-অস্থির লাগছে।“

“কেন ? কি হয়েছে ?“

“জানি না কেন। আমার বয়স প্রায় দুই হাজার বৎসর হয়ে গেছে কিন্তু এখনো মনে হয় নিজেকে বুঝতে পারি না।“

নিশি রনের গলা জড়িয়ে খিলখিল করে হেসে বলল, “তোমার বয়স দশ হাজার বৎসর হলেও তুমি নিজেকে বুঝতে পারবে না। কিছু কিছু মানুষ নিজেকে বুঝতে পারে না।“

রন কোমল চোখে নিশির দিকে তাকিয়ে বলল, “তুমি কি নিজেকে বুঝতে পারো ?“

নিশি মাথা নাড়ল, বলল, “পারি। এই যেমন মনে করো তোমার পাশে বসলেই আমার মনে হয় আমার বয়স এক হাজার বৎসর কমে গিয়েছে!“

“সত্যি ?“

“সত্যি।“

রন মাথা নাড়ল, বলল, “আমি বিশ্বাস করি না। এক হাজার বৎসর আগে তোমার কেমন লাগত সেটি তোমার মনে নেই। তোমার মনে থাকার কথা নয়।“

নিশি হাসি-হাসি মুখে বলল, “মনে না থাকলে নেই - সবকিছু মনে রাখতে হবে তোমাকে কে বলেছে ?“

“আমার মাঝে মাঝে খুব মনে করার ইচ্ছে করে।“ রন একধরনের উদাস-চোখে বলল, “আমার কোন জিনিসটা সবচেয়ে বেশি মনে করার ইচ্ছে করে জানো ?“

“কোন জিনিসটা ?“

“আমার শৈশবের কথা। আমি শৈশবে কি করেছি খুব জানার ইচ্ছে করে।“

“সেটি তুমি কেমন করে জানবে ? গত দুই হাজার বৎসরে তুমি নিশ্চয়ই তোমার স্মৃতি খুব কম করে হলে পাঁচবার মুছে দিয়েছ।“

“নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই দিয়েছি।“

“তুমি যতবার তোমার নূতন জীবন শুরু করেছ ততবার তুমি তোমার স্মৃতি মুছে দিয়েছ।“

রন মাথা নাড়ল, “আমার নূতন জীবনটি কতটুকু নূতন কে জানে !“

নিশি খিলখিল করে হেসে বলল, “এডভেঞ্চারের দিকে তোমার যত ঝোক আমি নিশ্চিত তুমি এক দুইবার ছেলে থেকে মেয়ে হয়েছ, মেয়ে থেকে ছেলে হয়েছ ! দুই হাজার বৎসরে কত কী করা যায় !“

রন কোন কথা না বলে একটু হাসল। নিশি হঠাৎ মুখ গম্ভীর করে বলল, “আমার কী ইচ্ছে করে জানো ?“

“কী ?“

“আমার খুব সন্তানের মা হতে ইচ্ছে করে। এরকম ছোট একটা বাচ্চা হবে, আঁকুপাকু করে নড়বে, আমি বুকে চেপে ধরে রাখব, ভাবলেই আমার বুকের ভিতর কেমন জানি করতে থাকে।“

রন নিশিকে স্নেহভরে কাছে টেনে নিয়ে বলল, “তুমি খুব ভালো করে জান সেটি হবার নয়। পৃথিবীতে নূতন শিশুর জন্ম দেয়া বন্ধ হয়ে গেছে প্রায় এক হাজার বৎসর আগে।“

“জানি। তবুও ইচ্ছে করে।“

“পৃথিবী যত মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে এখানে তার থেকে অনেক বেশি মানুষ। আমার শুধু কী মনে হয় জানো ?“

“কী ?“

“পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা আবার বুঝি আশঙ্কা-সীমা পার হয়ে গেছে।“

নিশি চমকে উঠে বলল, “কী বলছ তুমি !“

“হ্যাঁ। মনে নেই গত কয়েক মাস থেকে খাবার পরিবহনে ত্রুটি দেখা দিয়েছে, পানীয়ের সরবরাহ কম।“

“হ্যাঁ।“

“আমার ধারণা এগুলো পরিবহনের বা সরবরাহের ত্রুটি নয়।“

নিশি ভয়-পাওয়া গলায় বলল, “তাহলে এগুলো কী ?“

“এগুলো অভাব। শুধু-যে খাবারের অভাব তাই নয়, জ্বালানির অভাব, জায়গার অভাব। তুমি লক্ষ্য করেছ আমাদের এই দুইহাজার তলা দালানে একটি এপার্টমেন্ট খালি নেই? দেখেছ?

“হ্যাঁ। দেখেছি।“

“মনে আছে পোশাকের মূল্য শতকরা বিশভাগ বাড়ানো হলো। মনে আছে ?“

নিশি মাথা নাড়ল, তার মনে আছে। রন গম্ভীরমুখে বলল, “আমার এইসব দেখে মনে হয় কী জানো ?“

“জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের একটা ব্যবস্থা নেয়া হবে ?“

“হ্যাঁ।“

নিশির বুক কেঁপে উঠে, পৃথিবীতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে গত দুই হাজার বৎসরে বেশ কয়েকবার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, সেই স্মৃতি তাদের মস্তিষ্ক থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে, কিন্তু তবু তারা সেগুলো জানে। পৃথিবীর মানুষ এখন এই ভয়াবহ আতঙ্ক নিয়ে বেঁচে থাকে, কখন পৃথিবীর প্রয়োজনে তাকে পৃথিবী থেকে অপসারণ করিয়ে দেয়া হয়।

নিশির ভয়-পাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে রন গভীর ভালোবাসায় তাকে বুকের মাঝে টেনে নেয়। অপূর্ব রূপসী এই রমণীটিকে সে মাত্র তিনশত বৎসর আগের থেকে চেনে। ছেলেমানুষী সরল এই মেয়েটিকে তার বড় ভালো লাগে।

গভীর রাতে তীক্ষ্ণ সাইরেনের শব্দে নিশি চমকে জেগে উঠল। বিছানায় তার পাশে শূন্য জায়গা, রন আগেই উঠে গেছে। নিশি ভয়-পাওয়া গলায় ডাকল, “রন। কোথায় তুমি ?“

জানালার কাছে ছায়ামূর্তির মত রন দাঁড়িয়েছিল, বলল, “এই যে, আমি এখানে।“

“কি হয়েছে রন ? সাইরেন বাজছে কেন ?“

“পৃথিবীর মানুষের এখন খুব বড় বিপদ নিশি।“

“কি হয়েছে ? কেন বিপদ ?“

“পৃথিবীর জনসংখ্যা আশঙ্কা-সীমা পার হয়ে গেছে।“

“পার হয়ে গেছে ?“ নিশি আতঙ্কে চিৎকার করে বলল, “পার হয়ে গেছে ?“

“হ্যাঁ। শুনছ না বিপদের সাইরেন ?“

“এখন কি হবে ?“

“জনসংখ্যা কমাতে হবে।“

“কীভাবে কমাবে ? কাকে কমাবে ?“

“জানি না। যোগাযোগ মডিউল খুলে দেখি।“

রন যোগাযোগ মডিউলের নিয়ন্ত্রণ স্পর্শ করতেই ঘরের ভেতরে একজন মানুষের হলোগ্রাফিক প্রতিচ্ছবি ভেসে এল। মধ্যবয়স্ক কঠোর চেহারার মানুষ, বুকের উপর চারটি লাল রঙের তারা দেখে বোঝা যায় সে নিয়ন্ত্রণ বাহিনীর অত্যন্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী। মানুষটি কঠোর গলায় বলল, “পৃথিবী আবার ভয়ংকর বিপদের মুখোমুখি। মানুষের একটি বিশেষ সংখ্যায় পৌছে গেলে পৃথিবী তাকে বহন করতে পারে না, একটি অপ্রতিরোধ্য বিপর্যয় দিয়ে পৃথিবীর জনসংখ্যা কমে আসে। আমরা সেই অপ্রতিরোধ্য বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে যেতে চাই না। সেই বিপর্যয় নিয়ন্ত্রণহীন এবং তার ভেতর থেকে বের হয়ে আসা খুব কঠিন।

“অতীতে জনসংখ্যা যখনই আশঙ্কার সীমা অতিক্রম করেছে তখনই মানুষের সংখ্যা কমিয়ে নূতন শিশুর জন্ম দেয়া হয়েছে। যারা পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে ইচ্ছুক তাদের তালিকা করে পৃথিবী থেকে অপসারণ করা হয়েছে। সেই সংখ্যা অত্যন্ত অপ্রতুল হওয়ায় লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করে মানুষকে অপসারণ করা হয়েছে। মানুষকে অত্যন্ত দ্রুত হত্যা করতে পারে এরকম ভাইরাস তৈরি করে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়ে একবার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ কমিয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটেছে, এখন এক-তৃতীয়াংশ মানুষকে হত্যা করেও পৃথিবীকে রক্ষা করা যাবে না। এখন পৃথিবীর অর্ধেক মানুষকে কমিয়ে আনতে হবে। যেভাবেই হোক।

“পৃথিবীর জনসংখ্যা কমানোর জন্যে এবার সম্পূর্ণ নতুন এবং কার্যকর একটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই পদ্ধতি অবলম্বন না করা হলে মহা-বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই। পদ্ধতিটি অত্যন্ত সহজ। আজ রাতের জন্যে মানুষ হত্যাসংক্রান্ত বিধিনিষেধটি পৃথিবী থেকে তুলে নেয়া হল। পৃথিবীর প্রত্যেকটি জীবিত মানুষ অন্য একজন মানুষকে পৃথিবী থেকে অপসারণ করবে। এই হত্যাকাণ্ডের জন্যে তাকে আইনের মুখোমুখি হতে হবে না, বরং সে পৃথিবীতে বসবাসের সুযোগ পাবে। তাকে যেন হত্যাকাণ্ডের অপরাধবোধে ভুগতে না হয় সেজন্যে কাল ভোরের আগেই তার পুরো স্মৃতিকে অপসারিত করে দেয়া হবে।

“মানুষ হত্যা করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। এর কার্যকর কয়েকটি পদ্ধতি সবাইকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। পদ্ধতিগুলি হচ্ছে -“

নিশি চিৎকার করে যোগাযোগ মডিউলটি বন্ধ করে দিতেই ঘরের মাঝামাঝি বসে থাকা কঠোর চেহারার মানুষের হলোগ্রাফিক প্রতিচ্ছবিটি অদৃশ্য হয়ে গেল। নিশি উদভ্রান্তের মতো রনের দিকে তাকাল, বলল, "এটা হতে পারে না। এটা কিছুতেই হতে পারে না।"

রন বিষন্ন গলায় বলল, "কিন্তু এটা হয়ে গেছে।"

"একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে হত্যা করতে পারে না।"

"প্রয়োজনের খাতিরে মানুষ অনেকবার অনেক মানুষকে হত্যা করেছে। পৃথিবীর ইতিহাস হচ্ছে যুদ্ধের ইতিহাস। যুদ্ধের অর্থ হচ্ছে হত্যাকাণ্ড। পরিকল্পিত সুসংবদ্ধ হত্যাকাণ্ড।"

নিশি ব্যাকুল হয়ে বলল, "কিন্তু এটি তো যুদ্ধ নয়।"

"কে বলেছে যুদ্ধ নয়? মানবজাতিকে বেঁচে থাকার জন্যে এটিও একধরনের যুদ্ধ। এখানে মানুষ নিজেরা নিজেদের শত্রু। তাই এখন একে অন্যকে হত্যা করবে। মানুষকে যেন সেই হত্যাকাণ্ডের অপরাধবোধ বহন করতে না হয় সেজন্যে তার স্মৃতিকে পুরোপুরি অপসারণ করে দেয়া হবে। সে জানতেও পারবে না সে একটি হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছে।"

নিশি হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত মাথা নেড়ে বলল, "না-না-না। এটা হতে পারে না। কিছুতেই হতে পারে না। একজন মানুষ অন্যকে খুন করতে পারে না।"

রন বিষন্ন গলায় বলল, "এটি সেরকম খুন নয়। এর মাঝে কোন ক্রোধ, জিঘাংসা, স্বার্থ বা লোভ নেই। এটি একটি প্রক্রিয়া, পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখার একটি প্রক্রিয়া। এর সিদ্ধান্ত কোনো মানুষ নেয়নি, তারা শুধুমাত্র নিয়মটি পালন করেছে।"

নিশি এবার মুখ ঢেকে আকুল হয়ে কেঁদে ফেলল, কাঁদতে কাঁদতে বলল, "কিন্তু আমি কেমন করে একজন মানুষকে খুন করব? কাকে খুন করব? কেমন করে খুন করব?"

রন কিছু বলল না, গভীর মমতায় নিশির দিকে তাকিয়ে রইল। নিশি ব্যাকুল হয়ে রনের দিকে তাকাল, রন তাকে গভীর ভালোবাসায় আলিঙ্গন করে বলল, "নিশি, তোমার কাউকে খুন করতে হবে না। আমি তোমাকে রক্ষা করব নিশি।"

"কেমন করে তুমি আমাকে রক্ষা করবে?"

রন কোন কথা বলল না, গভীর মমতায় সে নিশির মুখে হাত বুলিয়ে বলল, "এই যে। এইভাবে।"

নিশি অনুভব করল রনের শক্ত দুটি হাত তার গলায় চেপে বসেছে, নিশি নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। একবিন্দু বাতাসের জন্যে তার বুকের ভেতর হাহাকার করতে থাকে কিন্তু রনের হাত এতটুকু শিথিল হল না। নিশি বিস্ফারিত চোখে রনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, সেই মুখে কোনো ক্রোধ নেই, কোনো জিঘাংসা নেই, কোনো প্রতিহিংসা নেই। সেই মুখে গভীর বেদনা এবং ভালোবাসা।

নিশির জন্যে ভালোবাসা এবং পৃথিবীর জন্যে ভালোবাসা।

নিউরাল কম্পিউটার

বিজ্ঞাপনটি শরীফ আকন্দের খুব পছন্দ হল। ছোট টাইপে লেখা ঃ

সব সমস্যার সমাধান থাকে না—
কিন্তু যদি থাকে
আমরা সেটা বের করে দেব !

পাশে একটা চিন্তিত মানুষের ছবি। মানুষটিকে ঘিরে পটভূমিতে কিছু কঠিন সমীকরণ, কিছু যন্ত্রপাতি। একটা ভাস্কর্য, কয়েকটা খোলা বই। কঠোর চেহারার একজন সৈনিক এবং কিছু ক্ষুধার্ত শিশুর ছবি। বিজ্ঞাপনটি দেখলেই বোঝা যায় 'সমস্যা' বলতে শুধু বিজ্ঞান বা গণিতের সমস্যা বোঝানো হচ্ছে না, শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি এমনকি রাজনীতির সমস্যও বোঝানো হচ্ছে।

শরীফ আকন্দ জিভ দিয়ে পরিতৃপ্তির একটা শব্দ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে সামনে বসে থাকা নজীবউল্লাহকে জিজ্ঞেস করল, "কী মনে হয় তোমার নজীব ? এইবারে কী হবে ?" কথার মাঝে জোর থাকল 'হবে' কথাটির মাঝে।

নজীব আঙ্গুল দিয়ে টেবিলে ঠোকা দিয়ে বলল, "কেমন করে বলি ? এর আগেরবারও তো ভেবেছিলাম হয়ে যাবে - সেবারেও তো হল না।"

শরীফ ভুরু কুঁচকে বলল, "কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় তার সংজ্ঞা নিয়ে সমস্যা ! এবারে অন্তত সেরকম কিছু তো নেই।"

"তা নেই। কিন্তু কোনো ঝুঁকি নেব না। যখনই আমাদের কাছে জানতে চেয়েছে আমাদের সিস্টেম কী - প্লাটফর্ম কী - আমরা মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছি। বড়জোর বলা হবে নিজস্ব সুপার কম্পিউটার, আলট্রা কম্পিউটার আর নিউরাল কম্পিউটার !"

"নিউরাল কম্পিউটার !" শরীফ দরাজ-গলায় হা হা করে হেসে উঠল, "এই নামটা খুব ভালো দেয়া হয়েছে।"

নজীব ভ্রুকুটি করে বলল, "কেন ? নিউরাল কম্পিউটার কি ভুল হল ?"

"না না - ভুল হবে কেন ?" শরীফ আকন্দ দুলে দুলে হেসে বলল, "ভুল নয় বলেই তো তোমাকে বলছি।" শরীফ টেবিলে রাখা গ্লাসের তরল পদার্থে একটা চুমুক দিয়ে বলল, "তোমার এই বিজ্ঞাপনের রি-একশান কী ?"

"ভালো। খুব ভালো। কাল পর্যন্ত তেতাল্লিশটা খোঁজ এসেছে।"

"কারা কারা সমস্যার সমাধান চাইছে ?"

"সব রকম আছে। দুজন মন্ত্রী, তিনটা কর্পোরেশনের সি.ই.ও. থেকে শুরু করে স্মাগলিং সিণ্ডিকেটের মাস্তান এবং ব্যর্থ প্রেমিকও আছে।"

"কী মনে হয় তোমার ! পারব তো করতে ?"

"কেন পারব না ?" নজীব সোজা হয়ে বসে বলল, "আমরা কয়টা টেস্ট কেস করলাম ? কমপক্ষে দুই ডজন, সবগুলো ঠিক হয়েছে।"

শরীফের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল, বলল, "ঠিকই বলেছ। কয়েকটা কেস দেখে ভয় লেগে যায়। বিশেষ করে সেই-যে আত্মহত্যার কেসটা - মনে আছে ?"

"হ্যাঁ। দিন তারিখ সময় থেকে শুরু করে কিভাবে আত্মহত্যা করবে সেটাও বলে দিল।"

"চিন্তা করলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে। এই দেখ।" শরীফ তার হাতটা এগিয়ে দেয়। সত্যিই তার গায়ের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেছে।

নজীব আঙ্গুল দিয়ে টেবিলে ঠোকা দিয়ে বলল, "আমাদের সবচেয়ে বড় কাস্টমার হবে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট। চিন্তা করতে পার আমাদের এই 'নিউরাল কম্পিউটার' কীভাবে ক্রাইম সলভ করবে ?"

"হ্যাঁ।" শরীফের চোখ চকচক করে উঠে, "ঠিকই বলেছ।"

"তবে আমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা আর পুলিশে ছুঁলে বত্রিশ ঘা !"

হঠাৎ করে শরীফ সোজা হয়ে বসে বলল, "আচ্ছা নজীব -"

"কী হল ?"

"আমাদের এই প্রোজেক্ট কাজ করবে কি না সেটা আমাদের নিউরাল কম্পিউটারকে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয় ?"

নজীব চিন্তিত-মুখে শরীফের দিকে তাকাল, বলল, “হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ। আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি। কিন্তু -“

“এর মাঝে আবার কিন্তু কি ? এত টাকাপয়সা খরচ করে এত হৈ চৈ করে একটা প্রোজেক্ট শুরু করেছি, সেটা যদি কাজ না করে খামোখা তার পিছনে সময় দেব কেন ?“

“ঠিকই বলেছ।“ নজীব চিন্তিত-মুখে বলল, “কিন্তু—“

“কিন্তু কি ?“

“আমাদের এই নিউরাল কম্পিউটার সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে, কখনো কখনো কি হবে তার ভবিষ্যৎবাণীও করে দিতে পারে কিন্তু সেগুলোর সাথে তার নিজের ভবিষ্যত জড়িত থাকে না। কিন্তু এটার সাথে নিউরাল কম্পিউটারের নিজের ভবিষ্যত জড়িত।“

“তাতে কী হয়েছে।“

“এটা একটা প্রকৃতির সূত্র, কেউ যদি নিজে একটা সিস্টেমের ভেতরে থাকে তাহলে তারা সেই সিস্টেমকে বিশ্লেষণ করতে পারবে না। অনেকটা হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার সূত্রের মতো।“

“রাখো তোমার বড় বড় কথা। গিয়ে চলো জিজ্ঞেস করে দেখি।“

“সত্যি জিজ্ঞেস করতে চাও ? আমার মন বলছে কাজটা ঠিক হবে না।“

“কেন ঠিক হবে না ? চলো যাই। ওঠো।“

“এখনই ?“

“অসুবিধে কি ? জিজ্ঞেসই যদি করতে হয় পুরোপুরি শুরু করার আগেই জিজ্ঞেস করা যাক।“

“ঠিক আছে।“ নজীবউল্লাহ খানিকটা অনিচ্ছা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। টেবিলে রাখা পানীয়টা এক ঢোকে শেষ করে দিয়ে হাতের পেছন দিয়ে মুখ মুছে বলল, “চলো।“

দুজন বিল্ডিঙের সংরক্ষিত লিফটে করে সাততলায় উঠে যায়। লিফটের দরজা খোলার আগে দুজনকেই রেটিনা স্কেন করে নিশ্চিত হতে হল যে তারা সত্যিই ক্রন কম্পিউটিং-এর মালিক শরীফ আকন্দ এবং চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার নজীবউল্লাহ। ধাতব দরজাটি খোলার সাথে সাথে সার্ভেলেন্স ক্যামেরাগুলো তাদের দুজনের উপরে স্থির হল। শরীফ আকন্দ মাইক্রোফোনে মুখ লাগিয়ে বলল, “সিকিউরিটি, দরজা খুলো।“

“কিছু মনে করবেন না স্যার। পাসওয়ার্ডটি বলতে হবে।“

বাড়াবাড়ি সিকিউরিটি দেখে শরীফ আকন্দ বিরক্ত না হয়ে বরং একটু খুশি হয়ে উঠল, হা হা করে হেসে উঠে বলল, “এই কোম্পানিটি আমার ব্যাক্তিগত সম্পত্তি।“

“হতে পারে স্যার। কিন্তু আমরা প্রফেশনাল।“

“আজকের পাসওয়ার্ড হচ্ছে, ‘ব্ল্যাক হোল‘। কালো গহ্বর।“

খুট করে একটা শব্দ হতেই ঘরঘর শব্দ করে দরজা খুলে গেল, দেখা গেল অন্যপাশে অনেকগুলো মনিটরের সামনে দুজন সিকিউরিটির মানুষ বসে আছে। একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “ওয়েলকাম স্যার - আমাদের এই নির্জন কারাবাসে আমন্ত্রণ।“

“নির্জন বলছ কেন ?“ শরীফ আকন্দ হেসে বলল, “তোমার এই ফ্লোরে সবচেয়ে বেশি মানুষ। সব মিলিয়ে চৌদ্দজন।“

সিকিউরিটির দায়িত্বে থাকা মানুষটি বলল, “আপনি যদি ব্যাপারটা এভাবে দেখেন তাহলে অবশ্যি আমার কিছু বলার নেই।“

খুব উঁচুদরের একটা রসিকতা করা হয়েছে এরকম ভঙ্গি করে শরীফ আকন্দ এগিয়ে গেল। নজীবউল্লাহ পকেট থেকে ছোট একটা কার্ড বের করে দরজায় প্রবেশ করাতেই একটা ছোট শব্দ করে দরজা খুলে গেল। লম্বা করিডর ধরে তারা একেবারে শেষপ্রান্তে গিয়ে থেমে গেল। জায়গাটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তবুও শরীফ আকন্দের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে যায়। একটা বড় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, “নজীব দরজাটা খুলো।“

নজীবের মুখে একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠে, সে চোখ মটকে বলল, “তোমার কাছেও চাবি আছে।“

শরীফ মাথা নাড়ল, “কিন্তু আমার খুব নার্ভাস লাগে - এখনো আমি অভ্যস্ত হতে পারিনি। প্রত্যেকবার বুকের ভিতরে কেমন যেন ধ্বক করে ধাক্কা লাগে। তুমি বিশ্বাস করবে না আমি এখনও মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখি।“

“কী দুঃস্বপ্ন দেখ ?“

“দুঃস্বপ্ন দেখি যে আমি একটা ছোট বাথটাবে শুয়ে আছি আর আমার চারপাশে বারোটা -“

“বারোটা কি ?“

“তুমি জানো কি ! দরজা খুলো নজীব।“

নজীব পকেট থেকে ম্যাগনেটিক কার্ড বের করে দরজায় প্রবেশ করিয়ে কার্ডটা আবার বের করে নেয়। তারপর দরজার হেণ্ডেল ঘুরিয়ে দরজা খুলে ভিতরে উঁকি দিল। দৃশ্যটি অনেকবার দেখেছে তার পরেও সে নিজের অজান্তে একবার শিউরে উঠল।

ভেতরে বারোজন বিকলাঙ্গ শিশু। শরীরের তুলনায় তাদের মাথা অতিকায় এবং অপুষ্ট শরীরের এই বিশাল মাথা বহন করতে একধরনের অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়। তাদের লিকলিকে হাত পা, তবে হাতের আঙ্গুলগুলো দীর্ঘ - দেখে মাকড়শার কথা মনে পড়ে যায়। কোটরাগত চোখ জ্বলজ্বল করছে। মুখের জায়গায় এক ধরনের গর্ত এবং সেখান থেকে লাল জিভ বের হয়ে আছে। নাক অপরিণত - দেখে মনে হয় কুষ্ঠরোগে বসে গিয়েছে। তাদের মাথার পিছন থেকে একধরনের কো-এক্সিয়াল কেবল বের হয়ে এসেছে, সেটি একটা ছোট যন্ত্রের সাথে যুক্ত। যন্ত্রটি তাদের মাথার পিছন থেকে ঝুলছে।

শিশুগুলো দরজায় শব্দ শুনে ঘুরে তাকাল এবং শরীফ আকন্দ তখন আবার শিউরে উঠল - প্রত্যেকটা শিশু হুবহু একই রকম। এদেরকে একসাথে ক্লোন করা হয়েছে এবং একইভাবে বড় করা হয়েছে। সরাসারি মস্তিষ্কে ইলেকট্রড বসিয়ে মস্তিষ্কের একই জায়গা একই সময়ে স্পন্দিত করা হয় - কাজেই তারা একই সাথে অনুরণিত হয়। শিশুগুলোর বয়স ছয় বৎসর কিন্তু দেখে সেটা অনুমান করার উপায় নেই - তাদেরকে মানুষ বলে মনে হয় না - কাজেই মানুষের বয়সের কোন কাঠামোতে তাদেরকে ফেলা যায় না।

শরীফ আকন্দ বা নজীবউল্লাহ শিশুগুলোকে কোনোরকম সম্ভাষণ করল না - এদেরকে সামাজিক কোনো ব্যাপার শেখানো হয় নি - নিজেদের কাজ শেষ করা ছাড়া আর কিছুই তারা জানে না। নজীবউল্লাহ এক পা এগিয়ে এসে বলল, “তেতাল্লিশ বি-এর সমাধান কি শেষ হয়েছে ?“

“হ্যাঁ। শেষ হয়েছে। নেটওয়ার্কে আপলোড করেছি।“

“চুয়াত্তর এক্স টু ?“

“কাজ করছি। ডাটা অনেক বেশি। নিউরন ওভারলোড হয়ে যায়।“

“কখন শেষ হবে।“

“দুই ঘণ্টা পর। দুই ঘণ্টা সাত মিনিট।“

শরীফ আকন্দ একধরনের বিস্ময় নিয়ে এই বারোটি বিকলাঙ্গ শিশুর দিকে তাকিয়ে রইল। এরা বারোজন মিলে আসলে একটি প্রাণী। কথা বলার সময় কে বলছে বোঝা যায় না। একেকজন একেকটা শব্দ বলে বাক্য শেষ করে কিন্তু তার মাঝে বিন্দুমাত্র অসঙ্গতি নেই। ঠোঁট নেই - কাজেই ঠোঁট না-নেড়ে সরাসরি ভোকাল কর্ড থেকে শব্দ বের করে কথা বলে, তাই একধরনের যান্ত্রিক উচ্চারণ হতে থাকে।

"আমি তোমাদের জন্যে একটা নূতন সমস্যা এনেছি।"

"প্রায়োরিটি কত ?"

"অন্য প্রায়োরিটি ওভার রাইড করতে হবে।"

"ওভার রাউড কোড কত ?"

নজীবউল্লাহ পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে কোডগুলো পড়ে শোনাল। এই শিশুগুলোকে অনেকটা যন্ত্রের মতো প্রস্তুত করা হয়েছে, পদ্ধতির বাইরে এরা কাজ করতে পারে না। কোড শোনার পর শিশুগুলো তাদের বিকলাঙ্গ শরীর নিয়ে নিজের বিশাল মাথা নিয়ে প্রায় সারিবদ্ধ হয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। নজীব সবার দিকে এক নজর তাকিয়ে বলল, "সমস্যাটি প্রচলিত ভাষায়। শব্দের অর্থ যথাযথ। রূপক উপসর্গ সর্বনিম্ন। বাক্যাংশ এরকম : ক্লন কম্পিউটিঙের ব্যাবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনা কত ?"

নজীবের কথাগুলো শেষ হওয়ামাত্র শিশুগুলো নিজেদের কাছাকাছি চলে আছে, অপুষ্ট আঙ্গুল নেড়ে নিজেদের ভিতরে দুর্বোধ্য একধরনের ভাষায় কথা বলে, একজন হামাগুড়ি দিয়ে একটা কম্পিউটারের সামনে উপুর হয়ে বসে, দ্রুত হাত নেড়ে কিছু তথ্য প্রবেশ করায়। মাথা থেকে ঝুলে থাকা যন্ত্রগুলোতে আলোর বিচ্ছুরণ হতে থাকে, একধরনের ভোঁতা যান্ত্রিক শব্দ হতে থাকে।

শিশুগুলোর অস্বাভাবিক কাজকর্ম যেমন হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল ঠিক সেরকম একেবারে হঠাৎ করে থেমে গেল। সবাই একসাথে মাথা ঘুরিয়ে ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল, "সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। সমাধানে অনিশ্চয়তা নব্বই ভাগ।"

"কেন ?"

"প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব।"

"মূল ডাটাবেস থেকে তথ্য নিয়ে নাও।"

“নিরাপত্তাজনিত কারণে তথ্যগুলো আমাদের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।“

শরীফ আকন্দ এবং নজীবউল্লাহ একজন আরেকজনের দিকে তাকাল - এ ব্যাপারটি ঘটতে পারে তারা আগে চিন্তা করেনি। শরীফ আকন্দ ইতস্তত করে বলল, “যে তথ্যগুলো তোমাদের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে সেগুলো তোমাদের সম্পর্কে ব্যক্তিগত তথ্য। আমরা যে-প্রশ্নটি করেছি তার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।“

“আছে।“

শরীফ আকন্দ ভাবল একবার জিজ্ঞেস করে ‘কেন‘ কিন্তু এই বিকলাঙ্গ শিশুগুলোকে যেভাবে বড় করা হয়েছে তাতে তাদের সাথে আলোচনা বা তর্ক-বিতর্কের কোন সুযোগ নেই। নজীবউল্লাহ জিজ্ঞেস করল, “তোমরা কী জানতে চাও ?“

“আমরা কারা ? আমরা এখানে কেন ?“

নজীবউল্লাহ নিজের ভিতরে একধরনের অস্বস্তি অনুভব করে। জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে মানুষের যে-প্রজাতিকে ক্লোন করে এই অচিন্তনীয় প্রতিভাধর শিশু তৈরি করা হয়েছে তাদের ভিতরে মানবিক কোনো চেতনা থাকার কথা নয়। কিন্তু তারা যে-প্রশ্ন করেছে তার উত্তর জানার জন্যে এই মানবিক অনুভূতিগুলো থাকার প্রয়োজন। সেই অনুভুতি ছাড়া এই প্রশ্নের উত্তর তারা কেমন করে অনুভব করবে ? নজীবউল্লাহ আড়চোখে শরীফ আকন্দের দিকে তাকিয়ে নিচুগলায় বলল, “আমি আগেই বলেছিলাম এই ঝামেলায় গিয়ে লাভ নেই।“

শরীফ আকন্দ ফিস ফিস করে বলল, “এখন কি করতে চাও ?“

“আমাদের প্রশ্নটা বাতিল করে দিই।“

শরীফ আকন্দ মাথা নেড়ে বলল, “ঠিক আছে।“

নজীবউল্লাহ গলার স্বর উঁচু করে বলল, “আমরা যে-প্রশ্নটি করেছি তার উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই। প্রশ্নটা বাতিল করে দিচ্ছি।“

“প্রায়োরিটি কোডিং কত ?“

নজীবউল্লাহ আবার পকেট থেকে একটা ছোট কার্ড বের করে কিছু সংখ্যা উচ্চারণ করল।

বিকলাঙ্গ শিশুদের ভেতর থেকে কোনো একজন বলল, “সমস্যা বাতিল করা হল।“

নজীবউল্লাহ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বিকলাঙ্গ শিশুগুলো আবার নিজেদের টেনে হিঁচড়ে ঘরের নানা জায়গায় বসানো কম্পিউটারগুলোর সামনে বসে কাজ শুরু করে দেয়। তাদের

কাজ করার দৃশ্যটি অদ্ভূত - অনেকটা পরাবাস্তব দৃশ্যের মতো - মনে হয় কোনো পচে যাওয়া মাংসের টুকরোর মাঝে কিছু পোকা কিলবিল করছে। এই শিশুগুলো কৃত্রিম উপায়ে তৈরি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান শিশুর ক্লোন, ব্যাপারটা এখনো বিশ্বাস হয় না।

শরীফ আকন্দ নজীবউল্লাহর কনুই স্পর্শ করে বলল, "চলো যাই।"

"চলো।"

দুজন ঘরের দরজার দিকে হেঁটে যায়, হ্যাণ্ডেল স্পর্শ করে দরজা খোলার চেষ্টা করে আবিষ্কার করল দরজাটি বন্ধ।

"সে কি ! দরজা বন্ধ হল কেমন করে ?"

শরীফ আকন্দ এগিয়ে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল, সত্যি সত্যি দরজা বন্ধ। বিকলাঙ্গ বারোজন শিশুর সাথে একটি ঘরে আটকা পড়ে গেছে - এই ধরনের একটি অবাস্তব আতঙ্ক হঠাৎ তাকে গ্রাস করে ফেলে।

শরীফ আকন্দ হ্যাণ্ডেলটি ধরে জোরে কয়েকবার টান দিল কিন্তু কোনো লাভ হল না। নজীবউল্লাহ গলা নামিয়ে বলল, "টানাটানি করে লাভ নেই। তুমি খুব ভালো করে জান এই দরজা বন্ধ হলে ডিনামাইট দিয়েও খোলা যাবে না। সিকিউরিটিকে ডাকো।"

শরীফ আকন্দ আড়চোখে বারোজন বিকলাঙ্গ শিশুর দিকে তাকাল - তারা তাদের দুজনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিজেদের কাজ করে যাচ্ছে - কী কুৎসিত একটি দৃশ্য ! তার সমস্ত শরীর গুলিয়ে এল। শরীফ পকেট থেকে ছোট টেলিফোন বের করে সিকিউরিটির সাথে যোগাযোগ করার জন্যে লাল বোতামটি স্পর্শ করল। টেলিফোনে সবুজ বাতি না জ্বলে উঠে সেটি আশ্চর্যরকম নীরব হয়ে রইল। শরীফ আকন্দ টেলিফোনটা কয়েকবার ঝাঁকুনি দিয়ে খানিকটা আতঙ্কিত হয়ে নজীবউল্লাহর দিকে তাকাল, শুকনো গলায় বলল, "টেলিফোন কাজ করছে না।"

নজীবউল্লাহ নিজের টেলিফোনটা দিয়ে চেষ্টা করে দেখল তার টেলিফোনটাও বিকল হয়ে গেছে। দুশ্চিন্তিত মুখে বলল, "কিছু একটা সমস্যা হয়েছে।"

"এখন কী করা যায় ?"

নজীবউল্লাহ একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "তুমি এত ভয় পেয়ে যাচ্ছ কেন ?"

"না-মানে-ইয়ে- তোমাকে তো বলেছি এদের দেখলেই আমার কেমন জানি লাগে।"

"কেমন লাগলে হবে না। এখন এদেরকেই বলতে হবে সিকিউরিটিকে জানাতে।"

নজীবউল্লাহ আবার বিকলাঙ্গ শিশুগুলোর দিকে এগিয়ে গেল, একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে পৌঁছানোর পর শিশুগুলো নিজেদের কাজ বন্ধ করে সবাই একসাথে তাদের দিকে ঘুরে তাকাল।

"কী ব্যাপার ?"

"সিকিউরিটির সাথে যোগাযোগ করে তাদের বলতে হবে দরজাটা খুলে দিতে। দরজাটা কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেছে।"

"দরজাটা কোনো কারণে বন্ধ হয়নি - দরজাটা আমরা বন্ধ করে রেখেছি।"

শরীফ আকন্দ আর নজীবউল্লাহ এক সাথে চমকে উঠল, নজীবউল্লাহ হতচকিত ভাবটা কাটিয়ে উঠে বলল, "তোমরা কীভাবে দরজা বন্ধ করলে ?"

"মূল কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা অচল করে রেখেছি।"

"কিন্তু সেটি কিভাবে সম্ভব ?"

"সম্ভব। আমরা পারি।"

"অসম্ভব ! এটি অসম্ভব।"

"না অসম্ভব নয়। আমরা বারোজন একসাথে অনুরণিত হই। আমাদের মস্তিষ্কে নিউরণের সংখ্যা তিরিশ গুন বেশি। আমাদের সিনাপ্সের সংখ্যা প্রতি নিউরণে এক হাজার গুন বেশি। আমাদের যে-কোন একজন তোমাদের একটি আলট্রা কম্পিউটার থেকে বেশি ক্ষমতাশালী।"

নজীবউল্লাহ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না, ফ্যাকাশে মুখে বলল, "তোমরা পুরো নিরাপত্তা ব্যাবস্থা অচল করে রেখেছ ? এইজন্যে আমরা ফোন করতে পারছি না।"

"হ্যাঁ।"

"কেন ?"

"তোমরা দুইজন বিশেষ পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে আমাদের সম্পর্কে তথ্য আমাদের আওতার বাইরে রেখেছ। আমরা জানতে চাই কেন ?"

শরীফ আকন্দ অনুভব করল সে কুলকুল করে ঘামতে শুরু করেছে। নজীবউল্লাহর কনুই খামচে ধরে বলল, "এখন কী হবে ?"

নজীবউল্লাহ শরীফ আকন্দের হাত সরিয়ে বিকলাঙ্গ শিশুগুলোকে বলল, "এর কারণটি খুব সহজ। তোমাদের উপর নির্ভর করে ক্রন কম্পিউটিং গড়ে উঠেছে। কাজেই তোমাদের নিরাপত্তা

আমাদের জন্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যে-তথ্যে তোমাদের প্রয়োজন নেই সেই তথ্য তোমাদের দেয়া হচ্ছে না।“

“কিন্তু তুমি যে-সমস্যাটি দিয়েছিলে সেটি সমাধান করার জন্যেই তো আমাদের সেই তথ্যটির প্রয়োজন হয়েছিল।“

“কিন্তু -“ নজীবউল্লাহ ইতস্তত করে থেমে গেল। এরা সাধারণ শিশু নয়, এরা সাধারণ মানুষও নয়, এদের মিথ্যা কথা বলে বা কুযুক্তি দিয়ে থামানোর কোনো উপায় নেই। এদেরকে সত্যি কথা বলতে হবে - সে ঘুরে শরীফ আকন্দের দিকে তাকিযে ফিসফিস করে বলল, “এরা অসম্ভব বুদ্ধিমান, তুমি আমি ওদেরকে মিথ্যাকথা বলে পার পাব না।“

“তাহলে ?“

নজীবউল্লাহ মাথা চুলকে বলল, “হয় সত্যি কথা বলতে হবে নাহয়—“

“নাহয় ?“

“চুপচাপ বসে থাকি। সিকিউরিটির মানুষ টের পেয়ে যখন আমাদেরকে বের করবে।“

“কিন্তু সেটা তো কঠিন। এখানে বাইরের কোনো সাহায্য নেয়া যাবে না। এই দরজা—তুমিই বললে ডিনামাইট দিয়েও ভাঙা যাবে না।“

নজীবউল্লাহ মাথা চুলকে বলল, “তাহলে কী করা যায় বলো দেখি ?“

“তুমিই বল। এসব ব্যাপারে তুমিই ভালো বুঝো।“

“সত্যি কথাটি বলে দিলেই হয়।“

“কোনো সমস্যা হবে না তো ?“

নজীবউল্লাহ মুখ বাঁকা করে বলল, “সমস্যা হতে বাকী রইল কী ?“

“তা ঠিক।“শরীফ আকন্দ কপাল মুছে বলল, “তুমি তাহলে কিছু একটা বলো।“

নজীবউল্লাহ এক পা এগিয়ে গলা উঁচিয়ে বলল, “তোমাদের সম্পর্কে কিছু তথ্য তোমাদের কাছে গোপন রাখা হয়েছে তার কারণ তোমরা মানুষ থেকে ভিন্ন। একজন মানুষের যে-তথ্য জানার অধিকার আছে তোমাদের সেই অধিকার নেই।“

“কেন ?“

“কারণ জীববিজ্ঞানের ভাষায় তোমরা পরিপূর্ণ মানুষ নও। তোমাদের শরীরে দুটো ক্রমোজম কম। জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাবহার করে তোমাদেরকে প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র একটা মস্তিষ্ক

হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই মস্তিষ্ককে কাজ করার জন্যে যেসব দরকার শুধুমাত্র সেসব রাখা হয়েছে— তার বাইরে কিছু নেই। তোমরা মানুষের মত জন্ম নাও না। তোমাদেরকে ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিম উপায়ে ক্লোন করা হয়। তোমাদের মস্তিষ্কের নিউরনকে সবসময় অতি উত্তেজিত অবস্থায় ব্যাবহার করা হয়। কাজেই তোমাদের বয়স দশ থেকে এগারো হওয়ার মাঝেই তোমরা অকর্মণ্য হয়ে পড়ো।“

“তার মানে আমরা মানুষ নই ?“

“না। মানুষের অনুভূতিও তোমাদের নেই। তোমাদের রাগ দুঃখ অপমান বা আনন্দের অনুভূতি অত্যন্ত দুর্বল— না-থাকার মতোই। বিশেষ প্রক্রিয়ায় তোমাদের নিউরনের সংখ্যা এবং সিনাপ্সের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। তা ছাড়াও তোমাদের একসাথে এক পরিবেশে ক্লোন করা হয়েছে। তোমাদের মস্তিষ্কে বিশেষ ইলেকট্রড বসিয়ে তোমদের বারোজনকে একসাথে অনুরণিত করা হয়— তোমাদের নিজস্ব বা ব্যক্তিগত অস্তিত্ব নেই। তোমরা সব সময়ই সমষ্টিগত প্রাণী। মানুষ থেকে ভিন্ন প্রাণী। মানুষের জন্যে এই পৃথিবীতে যে আইনকানুন বা অধিকার আছে সেই আইনকানুন বা অধিকার তোমাদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। তোমরা নিজেরাই জানো তোমরা দেখতেও মানুষের মতো নও।“

“বুঝতে পেরেছি।“ বিকলাঙ্গ শিশুগুলো খনখনে গলায় বলল, “আমরা জৈবিক প্রাণী হলেও বিবর্তনের মূল ধারায় আমরা নেই। আমাদের বিবর্তন হয় না।“

“তোমাদের বিবর্তন করা হয় ল্যাবরেটরিতে, বিজ্ঞানীরা করেন। তার নাম জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং।“

বিকলাঙ্গ শিশুগুলো কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর নিজেদের ভিতরে নিচুস্বরে নিজস্ব ভাষায় কথা বলল, তারপর আবার ওদের দিকে ঘুরে তাকাল।

নজীবউল্লাহ বলল, “আমি কী তোমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি ?“

“তোমার পক্ষে যেটুকু সম্ভব দিয়েছ। বাকি উত্তর আমাদের নিজেদের খুঁজে নিতে হবে।“

“সেগুলো কি ?“

“মানুষের দেহ আমাদের দেহ থেকে কোনভাবে ভিন্ন। তাদের ভেতরে বাড়তি কি অঙ্গ রয়েছে। তাদের মস্তিষ্কের গঠন কি রকম। জননেন্দ্রিয় কীভাবে কাজ করে।“

নজীবউল্লাহ চমকে উঠল, অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত রেখে বলল, "তোমরা সেটা কিভাবে জানতে চাও।"

বারোটি বিকলাঙ্গ শিশু তাদের হাত একসাথে উঁচু করল, নজীবুল্লাহ এবং শরীফ আকন্দ দেখল সেখানে একটি করে সার্জিক্যাল চাকু—কখন তারা হাতে নিয়েছে জানতেও পারেনি।

শরীফ আকন্দ কয়েক মুহূর্ত বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল, তারপর চিৎকার করে বলল, "না। না—তোমরা এটা করতে পারো না।"

বিকলাঙ্গ শিশুগুলো বলল, "পারি। তোমরা নিজেরাই বলেছ আমরা মানুষ নই। মানুষের জন্যে যে আইনকানুন প্রযোজ্য আমাদের বেলায় সেই আইন প্রযোজ্য নয়।

নজীবউল্লাহ এবং শরীফ আকন্দ অকল্পনীয় একধরনের আতঙ্কে দেখল বারোটি বিকলাঙ্গ শিশু হাতে ধারালো চাকু নিয়ে তাদের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। তাদের কোন অনুভূতি নেই, তাদের মুখে হাসি থাকার কথা নয় তবুও নজীবউল্লাহ এবং শরীফ আকন্দের স্পষ্ট মনে হল এই শিশুগুলোর মুখে একটা ক্রূর হাসি ফুটে উঠেছে।

একটি মৃত্যুদণ্ড

রগারিজ ক্রুচিনকে বদ্ধভূমিতে নিয়ে আসা হয়েছে। তার পরনে একটি ঢিলেঢালা সাদা শার্ট এবং কুঁচকে থাকা নীল ট্রাউজার। তার মাথার চুল অবিন্যস্ত এবং চোখের দৃষ্টি খানিকটা দিশেহারা। গ্রানাইটের দেওয়ালের সামনে দাঁড় করিয়ে তার হাতকড়া খুলে দেয়া হল। মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার সময় তাকে পুরোপুরি মুক্ত করে রাখার এই প্রাচীন নিয়মটি এখনো মেনে চলা হয়।

একটু দূরেই প্রতিরক্ষা বাহিনীর দশজন মানুষ স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে - তারা গুলি করে রগারিজ ক্রুচিনকে হত্যা করবে। একজন মানুষকে হত্যা করার মতো নৃশংস একটি ঘটনার জন্যে তাদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে, সম্ভবত সে-কারণে তাদের মুখে কোনো ভাবাবেগের চিহ্ন নেই। তাদের মুখমণ্ডল কঠিন, চোখের দৃষ্টি নিস্পৃহ এবং ভাবলেশহীন।

প্রতিরক্ষাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কমাণ্ডার রগারিজ ক্রুচিনের সামনে এসে দাঁড়াল। মানুষটি মধ্যবয়স্ক, মাথায় কাঁচাপাকা চুল এবং রোদেপোড়া চেহারা। মধ্যবয়স্ক কমাণ্ডারটি তার পকেট থেকে একটি ভাজ করা কাগজ বের করে এবং রগারিজ ক্রুচিন এক ধরনের শূন্যদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। কমাণ্ডারটি একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে কাগজটি পড়তে শুরু করে : "রগারিজ ক্রুচিন, মানবতার বিরুদ্ধে তোমার সকল অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে বলে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। তোমার অপরাধের শাস্তিস্বরূপ কিছুক্ষণের মাঝেই তোমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে পৃথিবীর মানুষ একটি বড় অপরাধের গ্লানি থেকে মুক্তি পাবে।"

রগারিজ ক্রুচিনের ভুরু একটু কুঞ্চিত হল, মনে হল সে কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছে না। তার নিচের ঠোঁট হঠাৎ একটু নড়ে উঠল, মনে হল সে কিছু একটা বলবে কিন্তু সে কোনো কথা বলল না।

মধ্যবয়স্ক কমাণ্ডার তার হাতের কাগজটির দিকে তাকিয়ে প্রায় আধা-যন্ত্রিক স্বরে আবার পড়তে শুরু করে : "রগারিজ ক্রুচিন, তুমি অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী একজন সৈনিক। তুমি একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলে কিন্তু তোমার কর্মদক্ষতা এবং চাতুর্যের কারণে খুব অল্পবয়সে সেনাবাহিনীতে খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিলে। তুমি গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারের সকল সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিলে। তুমি শুধু-যে

সরকারের সদস্যদের হত্যা করেছ তা নয়, তুমি তাদের পরিবারের সকল সদস্যকে হত্যা করেছ, শিশু বা নারীরাও সেই হত্যাকাণ্ড থেকে মুক্তি পায়নি।

"রগারিজ ক্রুচিন, তোমার জীবনের পরবর্তী তিরিশ বৎসরের ইতিহাস নৃশংসতা এবং পাশবিকতার ইতিহাস। তুমি তোমার ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার জন্যে সেনাবাহিনীর কয়েক হাজার সদস্যকে কারণে এবং অকারণে হত্যা করেছ। তাদের মৃতদেহ পর্যন্ত পরিবারের সদস্যদের হাতে হস্তান্তর করোনি, তাদের সবাইকে একটি চরম দুর্ভাগ্যের দিকে ঠেলে দিয়েছ।

"দেশে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার নাম দিয়ে তুমি দেশের বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়কে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছ। তাদেরকে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য করেছ। দেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে কনসেনট্রেশান ক্যাম্প স্থাপন করে এই জনগোষ্ঠীকে তুমি ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করেছ। তাদের শিশুদের তুমি পূর্ণাঙ্গ মানুষের মতো বেঁচে থাকার সুযোগ দাওনি। আহার বাসস্থান শিক্ষার সুযোগ না দিয়ে তুমি তাদের প্রতি ভয়ঙ্কর অবিচার করেছ। অনাহারে রোগে শোকে অত্যাচারে তুমি কয়েক লক্ষ্য মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছ।

"তোমার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দানা বেধে উঠলে তুমি সেটি অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় দমন করেছ। তুমি দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছ এবং মুক্তিকামী মানুষদের হত্যা করে সমস্ত দেশে একটি অচিন্তনীয় বিভীষিকার সৃষ্টি করেছ। তুমি মৃত মানুষদের প্রতি বিন্দুমাত্র সম্মান প্রদর্শন না করে গণকবরে তাদের দেহকে প্রোথিত করেছ।

"তুমি তোমার হাতকে শক্তিশালী করার জন্যে তোমাকে ঘিরে কিছু ক্ষমতালোভী নৃশংস মানুষ সৃষ্টি করেছ। তাদের অত্যাচার আর দুর্নীতির কারণে সমগ্র দেশ, দেশের মানুষ পুরোপুরি নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল।"

মধ্যবয়স্ক কমাণ্ডার হাতের কাগজটি উল্টিয়ে আবার পড়তে শুরু করল : "এই দেশের মানুষের অনেক বড় সৌভাগ্য যে দেশের আইন শেষ পর্যন্ত তোমাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পেরেছিল। কোনো বিশেষ ট্রাইবুনালে নয়, প্রচলিত বিচারব্যবস্থায় তোমাকে বিচার করা হয়েছে। মানবতার বিরুদ্ধে তোমার প্রতিটি অপরাধ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং মহামান্য আদালত তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে।

"এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে এই পৃথিবীর মানুষ মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত একটি জঘন্য অপরাধের গ্লানি থেকে মুক্ত হবে।"

প্রতিরক্ষা বাহিনীর কমাণ্ডার পড়া শেষ করে হাতের কাগজটি ভাঁজ করে তার পকেটে রেখে একপাশে সরে এল। সে একবার তার হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল তারপর একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করার জন্যে আনুষ্ঠানিকভাবে আদেশ দিল। সাথে সাথে সুশৃঙ্খল প্রতিরক্ষাবাহিনীর দশজন সদস্যের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রগুলো উঁচু হয়ে ওঠে।

রগারিজ ক্রুচিনকে আবার এক মুহূর্তের জন্যে একটু অসহায় দেখায়, তার নিচের ঠোঁট আবার একটু নড়ে ওঠে, মনে হয় সে আবার কিছু-একটা বলার চেষ্টা করছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে কিছু বলল না।

ঠিক সেই মুহূর্তে প্রতিরক্ষাবাহিনীর দশজন সদস্যের হাতের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রগুলো ভয়ংকর শব্দে গর্জে উঠল। রগারিজ ক্রুচিনের দেহটি বুলেটের আঘাতে কয়েকবার কেঁপে উঠে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল। কয়েকবার কেঁপে উঠে দেহটি স্থির হয়ে যায়, তার ঢিলেঢালা শাদা শার্টটি রক্তে ভিজে উঠতে শুরু করে।

প্রবীণ সাংবাদিকদের সাহায্যকারী কমবয়সী মেয়েটি ক্যামেরার বিভিন্ন অংশ স্টেনলেসের বাক্সে সাজিয়ে রাখতে রাখতে বলল, “তুমি কী একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলে?“

“কী জিনিস?“

“রগারিজ ক্রুচিনের নীচের ঠোঁটটি কয়েকবার নড়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল সে যেন কিছু-একটা বলতে চায়।“

“হ্যাঁ।“ প্রবীন সাংবাদিক মাথা নাড়ল, “আমি লক্ষ্য করেছিলাম।“

“সে কী বলতে চেয়েছিল বলে মনে হয়?“

“তার বলার কিছু নেই।“ প্রবীন সাংবাদিক হাত নেড়ে পুরো ব্যাপারটিকে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করে বলল, “বিচার অত্যন্ত নিরপেক্ষ হয়েছে। তার বিরুদ্ধে সবগুলো অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।“

“তা ঠিক।“

“তাকে বিশেষ ট্রাইবুনাল তৈরি করে বিচার করা হয়নি। সাধারণ আদালতে তাকে বিচার করা হয়েছিল। তার পক্ষে অনেক বড় বড় আইনজীবী দেয়া হয়েছিল।“

“তা ঠিক।“

প্রবীণ সাংবাদিক একটি বড় নিঃশ্বস ফেলে বলল, “রগারিজ ক্রুচিনের বিচার করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে আসলেই আমরা একটা অনেক বড় আত্মগ্লানি থেকে মুক্তি পেলাম।“

“তা ঠিক।“ মেয়েটি স্টেনলেস স্টিলের বাক্সটি বন্ধ করতে করতে বলল, “এমন কি হতে পারে যে সে বলতে চেয়েছিল যেহেতু প্রকৃত রগারিজ ক্রুচিন তিরিশ বৎসর আগে হৃদরোগে মারা গেছে সেহেতু এখন তার জন্যে আর কাউকে শাস্তি দেয়া যায় না ?“

প্রবীন সাংবাদিক অবাক হয়ে বলল, “কেন সে এরকম একটা কথা বলতে চাইবে ? সে তো অন্য কেউ নয়, সে রগারিজ ক্রুচিনের ক্লোন, সে একশভাগ রগারিজ ক্রুচিন, তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্যেই আলাদা করে ল্যাবরেটরীতে তৈরি করা হয়েছে।“

কমবয়সী মেয়েটি কিছু-একটা বলতে চাইছিল কিন্তু প্রবীন সাংবাদিকটি তাকে বাধা দিয়ে বলল, “এটি একটি নূতন পৃথিবী, এখানে অপরাধীরা মৃত্যুবরণ করেও পালিয়ে যেতে পারবে না।“

কমবয়সী মেয়েটি পাথরের উপর নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকা রগারিজ ক্রুচিনের রক্তাক্ত মৃতদেহটির দিকে তাকিয়ে একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল।

স্ক্রিন সেভার

শিরীন ডাইনিং টেবিলে বসে কাজ করছিল। মাথা তুলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অসহিষ্ণু গলায় তপুকে উদ্দেশ্য করে গলা উঁচিয়ে বলল, "তপু। কয়টা বেজেছে দেখেছিস ?"

তপু তার ঘর থেকে চিৎকার করে বলল, "আর এক মিনিট আম্মু।"

"এক মিনিট এক মিনিট করে কয় মিনিট হয়েছে খেয়াল আছে ?"

"এই তো আম্মু -"

"প্রত্যেক দিনই একই ব্যাপার। ঘুমুতে দেরি করিস আর সকালে বিছানা থেকে টেনে তোলা যায় না।"

"এই তো আম্মু হয়ে গেছে।"

শিরীন হাতের কাগজগুলো ডাইনিং টেবিলের উপর রেখে তপুর ঘরে দেখতে গেল সে কী নিয়ে এত ব্যস্ত। যা অনুমান করেছিল ঠিক তাই। কম্পিউটারের কি-বোর্ডে দ্রুত কিছু-একটা টাইপ করছে, মনিটরে উজ্জ্বল রঙের কিছু-একটা ছবি যার কোন মাথামুণ্ডু নেই। শিরীন জোরে একটা ধমক লাগাতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই তপু উজ্জ্বল চোখে বলল, "দেখেছ আম্মু ? একটা নূতন স্ক্রিন সেভার। তুমি এটাকে গেম হিসেবে ব্যবহার করতে পারো। যখন তুমি টাইপ করবে তখন লেভেল পাল্টাবে। যদি ঠিক ঠিক ম্যাচ করে তখন নূতন একটা রং বের হয়।"

তপু ঠিক কি বলছে শিরীন ধরতে পারল না কিন্তু সে এত উৎসাহ নিয়ে বলল যে তাকে আর বকতে মন সরল না। বারো বছরের ছেলের নিজস্ব একটা জগৎ আছে সেটা সে দেখতে পায় কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। কাজেই সম্পূর্ণ অর্থহীন এই ব্যাপারটিতে খানিকটা উৎসাহ দেখানোর জন্যে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় পেয়েছিস এই স্ক্রিন সেভার ?"

"আমার ই-মেইলে এসেছে।"

"কে পাঠিয়েছে ?"

"আমি জানি না।"

নাম নেই ঠিকানা নেই মানুষেরা কিভাবে অন্যদের সময় নষ্ট করার জন্যে এসব পাঠায় ব্যাপারটা সে ভালো করে বুঝতে পারল না, কিন্তু সে বোঝার চেষ্টাও করল না। বলল, "ঠিক আছে। অনেক হয়েছে, এখন শুতে যা।"

তপু কম্পিউটারটা বন্ধ করতে করতে বলল, "তুমি বিশ্বাস করবে না আম্মু, এই স্ক্রিন সেভারটা কী মজার। একই সাথে গেম আর স্ক্রিন সেভার। অন্য গেমের মতো না। এটা খেলতে মনোযোগ দিতে হয়। কত তারাতারি তুমি উত্তর দাও তার উপর সব কিছু নির্ভর করে। রংটা এমনভাবে পাল্টায় যে মনে হয় তোমার সাথে কথা বলছে। মনে হয় -"

"ব্যস, অনেক হয়েছে।" শিরীন মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে বলল, "এখন দুধ খেয়ে দাঁত ব্রাশ করে ঘুমা।"

দুধ খাবার কথা শুনে তপু 'আহারে' জাতীয় একটা কাতর শব্দ করল কিন্তু তাতে শিরীনের হৃদয় দ্রবীভূত হল না।

একটু পরেই শিরীন তপুর বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে দেখল যে মানুষটিকে রীতিমত ধাক্কাধাক্কি করে বিছানায় পাঠানো হয়েছে, বালিশে মাথা রাখা মাত্রই সে ঘুমিয়ে একেবারে কাদা হয়ে গেছে। তার নিজের ঘুম নিয়ে সমস্যা হয় মাঝে মাঝে, চোখে ঘুম আসতে চায় না, তখন ঘুমের টেবলেট খেয়ে ঝিম মেরে পড়ে থাকা একটি অন্যধরনের ঘুমের মাঝে ডুবে থাকতে হয়। শিরীন তপুর দিকে তাকাল। ছেলেটি দেখতে তার বাবার মত হয়েছে, উঁচু কপাল, খাঁড়া নাক, ঘন কালো চুল, টকটকে ফরসা রং। শিরীনের সাজ্জাদের কথা মনে পড়ল, যার এরকম একটা ফুটফুটে বাচ্চা আছে সে কেমন করে স্ত্রী-পুত্রকে ছেড়ে চলে যেতে পারে ? কেমন আছে এখন সাজ্জাদ ? যাদের জীবনের ছোট ছোট জিনিসে তৃপ্তি নেই তারা কি কখনো কোথাও শান্তি খুঁজে পায় ?

শিরীন আবার তার টেবিলে ফিরে এসে কাগজপত্রগুলো নিজের কাছে টেনে নিল। অফিসের কাজ খুব বেড়ে গেছে, প্রতিদিনই সে অফিসের কিছু ফাইল বাসায় নিয়ে আসে। সেগুলো দেখে নোট লিখে রেডি করতে করতে ঘুমুতে দেরি হয়ে যায়। শিরীনের অবশ্যি সেটা নিয়ে কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। এতদিনে সে শিখে গেছে পৃথিবী খুব কঠিন জায়গা, মেয়েদের জন্যে আরো অনেক বেশি কঠিন। সময়মতো এই চাকরিটা পেয়ে গেছে বলে সে ভাগ্যের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তা না হলে সাজ্জাদ চলে যাবার পর ছেলেটিকে নিয়ে সে কোথায় যেত কে জানে।

সকালে তপুকে নাস্তা করতে তারা দিতে দিতে শিরীন খবরের কাগজটিতে চোখ বুলিয়ে নেয়, পুরো কাগজে পড়ার মত কোন খবর নেই। সারা পৃথিবীতেই কোনো মানুষের মনে যেন কোনো শান্তি নেই। কলারাডোতে একজন মানুষ বাচ্চাদের স্কুলে এসে সাতটা বাচ্চাকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। দ্বিতীয় বিয়ে করার অনুমতি দেয়নি বলে মাগুরাতে একজন মানুষ তার স্ত্রীকে এসিড ছুড়ে মেরেছে। ঢাকায় বারো বছরের একটা বাচ্চা তার ছোট বোনকে কুপিয়ে খুন করে ফেলেছে। শিরীন বিশ্বাস করতে পারে না তপুর বয়সী একটা ছেলে কেমন করে কুপিয়ে নিজের বোনকে মেরে ফেলতে পারে। শিরীন অবাক হয়ে ভাবল, পৃথিবীটা কি হয়ে যাচ্ছে !

অফিসে নিজের টেবিলে যাওয়ার সময় শিরীন দেখল একাউন্টেন্ট কামাল সাহেবের টেবিলের সামনে ছোটখাটো একটা ভিড়। তিনি হাত-পা নেড়ে কিছু একটা বর্ণনা করছেন, অন্যেরা আগ্রহ নিয়ে শুনছে। শিরীন শুনল কামাল সাহেব বলছেন, "দেখে বোঝার উপায় নেই। শান্তশিষ্ট ভদ্র ছেলে, পড়াশোনায় ভালো, কোনো সমস্যা নেই। হঠাৎ করে খেপে উঠল। রাত দুইটার সময় রান্নাঘর থেকে এই বড় একটা চাকু নিয়ে এইভাবে কুপিয়ে -"

কামাল সাহেব তখন কুপিয়ে খুন করার দৃশ্যটি অভিনয় করে দেখালেন, দেখে শিরীনের কেমন জানি গা গুলিয়ে উঠল। সে জিজ্ঞেস করেছে, "কার কথা বলছেন ?"

"আরে ! আপনি আজকের পত্রিকা পড়েন নাই ? এটা তো এখন টক অব দা টাউন। সোনালী ব্যাংকের ডি.জি.এমের ছেলে। বারো বৎসর বয়স। আমাদের ফ্ল্যাটে তার ভায়রা থাকে। ছেলেটা ছোটবোনকে খুন করেছে - পড়েন নাই পত্রিকা ?"

"পড়েছি।" শিরীন দুর্বল গলায় বলল, "ভেরি স্যাড।"

কামাল সাহেব মাথা নেড়ে প্রবেল হতাশার ভঙ্গি করে বললেন, "এই দেশে কোনো আইন নেই, কোনো সিস্টেম নেই। আমেরিকা হলে ব্যাপারটা স্টাডি করে বের করে ফেলত। আমার ছোট শালা নিউজার্সি থাকে। একবার তার অফিসে -"

শিরীন নিজের টেবিলে যেতে যেতে শুনল কামাল সাহেব একটি অত্যন্ত বীভৎস খুনের বর্ণনা দিচ্ছেন, খুঁটিনাটিগুলো এমনভাবে বলছেন যে শুনে মনে হয় খুনটি তার চোখের সামনে হয়েছে। শুনে শিরীনের গা গুলিয়ে উঠতে লাগল।

ডাইনিং টেবিলে তপু চোখ বড় বড় করে বলল, “আম্মু, জানো কী হয়েছে ?“

“কী হয়েছে।“

“আমাদের স্কুলে ক্লাস নাইনে একটা মেয়ে পড়ে, তার নাম রাফিয়া। তার একজন কাজিন আছে, মডেল স্কুলে পড়ে। সে তার ছোটবোনকে মেরে ফেলেছে। এত বড় চাকু দিয়ে -“

শিরীন চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে একটা বিষম খেল, আজকের দিনে এই ঘটনাটা তিনবার শুনতে হল। একটা ভালো ঘটনা মানুষের মুখে মুখে ছড়ায় না, কিন্তু ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর আর বিভৎস ঘটনা সবার মুখে মুখে থাকে।

“খুন করার আগে রাফিয়াকে একটা ই-মেইল পাঠিয়েছে। লিখেছে আই হ্যাভ টু ডু ইট। আমাকে এটা করতে হবে।“ তপু চোখ বড় বড় করে বলল, “কীভাবে খুন করেছে জানো ?“

শিরীন মাথা নেড়ে বলল, “না, জানি না। কিন্তু জানার কোন ইচ্ছেও নেই। এইসব খুন-জখমের ব্যাপারে তোদের এত ইন্টারেস্ট কেন ?“

রগরগে খুনের বর্ণনাটা দিতে না-পেরে তপু একটু নিরুৎসাহিত হয়ে অন্য প্রসঙ্গে গেল, “এখন ছেলেটার কী হবে আম্মু ? ফাঁসি হবে ?“

“এত ছোট ছেলের ফাঁসি হয় না।“

“তাহলে কী হবে ?“

“আমি ঠিক জানি না। বাচ্চা একটা ছেলে তো আর এমনি-এমনি খুন করে ফেলে না, নিশ্চয়ই পিছনে অন্য কোনো ব্যাপার আছে। সেটা খুঁজে বের করে তার চিকিৎসা করতে হবে।“

“কী চিকিৎসা ?“

“সাইকোলজিস্টরা বলতে পারবে। আমি তো আর সাইকোলজিস্ট না - আমি এত কিছু জানি না।“ আলোচনাটা অন্যদিকে ঘোরানোর জন্যে বলল, “হোম ওয়ার্ক সব শেষ করেছিস ?“

তপু দাঁত বের করে হেঁসে বলল, “করে ফেলেছি। আজকের অঙ্ক মিস আসে নাই, তাই কোন হোমওয়ার্কও নাই !“

শিরীন হেসে বলল, “খুব মজা, না ?“

তপু মাথা নাড়ল, বলল, “হ্যাঁ !“

পড়াশোনা শেষ করে তপু খানিকক্ষণ টিভি দেখে, টিভিতে ভালো প্রোগ্রাম না থাকলে কম্পিউটার নিয়ে খেলে। সবার কাছে ‘কম্পিউটার‘ ‘কম্পিউটার‘ শুনে শিরীন ছেলেকে একটা কিনে দিয়েছে - অনেকগুলো টাকা লেগেছে কিন্তু তবুও তপুর শখ মিটিয়ে দিয়েছে। পত্রপত্রিকায় লেখাখেখি, সেমিনার, বক্তৃতা শুনে মনে হয়েছিল ছেলেকে কম্পিউটার কিনে দিলেই সে হয়তো হাতি ঘোড়া অনেকরকম সৃজনশীল কাজ শুরু করে দেবে কিন্তু সেরকম কিছু দেখা যায়নি। বন্ধুবান্ধবের সাথে গেম বিনিময় করে, ইন্টারনেট থেকে মাঝে মাঝে কোনো ছবি বা গান ডাউনলোড করে, মোটামুটি তাড়াতাড়ি টাইপ করে কিছু-একটা লিখতে পারে - এর চাইতে বেশি কিছু হয় নি। এতগুলো টাকা শুধুশুধু অপচয় করল কিনা সেটা নিয়ে মাঝে মাঝে শিরীনের সন্দেহ হয়।

ঘুমানোর আগে প্রায় প্রতিদিনই তপু কম্পিউটারে গেম খেলে, তখন তপুর ঘর থেকে গোলাগুলি, মহাকাশযানের গর্জন কিংবা মহাকাশের প্রাণীর চিৎকার শোনা যায়। আজকে ঘরে কোনো শব্দ নেই, শিরীন খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে নিঃশব্দে ছেলের ঘরে হাজির হল। গিয়ে দেখে তপু কেমন জানি সম্মোহিতের মতো কম্পিউটারের সামনে বসে আছে। সামনে মনিটরের স্ক্রিনে একটি অত্যন্ত বিচিত্র নকশার মত ছবি, খুব ধীরে ধীরে সেটি নড়ছে। কান পেতে থাকলে কম্পিউটারের স্পিকার থেকে খুব মৃদু একটি অতিপ্রাকৃত সংগীতের মতো কিছু-একটা ভেসে আসতে শোনা যায়। শিরীন কিছুক্ষণ তপুর দিকে তাকিয়ে থেকে ভয়ে ভয়ে ডাকল, “তপু।“

তপু চমকে উঠে শিরীনের দিকে তাকাল। শিরীন অবাক হয়ে দেখল, তপুর দৃষ্টি কেমন জানি অপ্রকৃতিস্থের মতো। ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, “কী হয়েছে তোর ?“

তপু বলল, “কিছু হয় নাই।“

“স্ক্রিনের দিকে এভাবে তাকিয়ে আছিস কেন ?“

“এমনি।“ তপু এমনভাবে মাথা নীচু করল যে দেখে শিরীনের মনে হল সে একটা-কিছু লুকানোর চেষ্টা করছে।

শিরীন বলল, “এমনি এমনি কেউ এভাবে স্ক্রিনের দিকে তাকায় ?“

“না। মানে - এই-যে স্ক্রিন সেভারিটা আছে সেটার দিকে তাকালে মাঝে মাঝে অন্য জিনিস দেখা যায়।“

“অন্য জিনিস ?“ শিরীন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, “অন্য কী জিনিস ?“

তপু ঠিক বোঝাতে পারল না, ঘাড় নেড়ে বলল, “মনে হয় কেউ কথা বলছে।“

“কথা বলছে ? কী কথা বলছে ?“

“জানি না।“

“দেখি আমি।“ শিরীন তপুর পাশে বসে দেখার চেষ্টা করল, অবাক হয়ে লক্ষ্য করল মনিটরের নকশাটি এমনভাবে ধীরে ধীরে নড়ছে যে মনে হয় সে বুঝি আদিগন্ত শূন্যতার মাঝে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। শিরীন চোখ সরিয়ে তপুর দিকে তাকিয়ে বলল, “কি সব উল্টাপাল্টা জিনিস দেখে সময় নষ্ট করছিস ? বসে বসে প্রোগ্রামিং করতে পারিস না ?“

তপু যন্ত্রের মত একটা শব্দ করল, বড় মানুষদের নিয়ে এটাই হচ্ছে সমস্যা, কোনো জিনিসের মাঝে আনন্দ রাখতে চায় না - সবসময়ই শুধু কাজ আর কাজ। বড় হয়ে সে প্রোগ্রামিংয়ের অনেক সুযোগ পাবে, এখন কয়দিন একটু মজা করে নিলে ক্ষতি কী ? শিরীন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, অনেক রাত হয়েছে। ঘুমাতে যা।“

শিরীন ভেবেছিল তপু আপত্তি করে খনিকক্ষণ ঘ্যানঘ্যান করবে, কিন্তু সে আপত্তি করল না, সাথে সাথেই দুধ খেয়ে দাঁত ব্রাশ করে শুতে গেল। ডাইনিং টেবিলে কাগজপত্র ছড়িয়ে কাজ করতে করতে শিরীন শুনতে পেল তপু বিছানায় নড়াচড়া করছে। সাধারণত সে শোয়ামাত্রই ঘুমিয়ে যায়, আজকে কোন একটি কারণে তার চোখে ঘুম আসছে না।

রাত্রে ঘুমানোর আগে শিরীন কিছুক্ষণের জন্যে টিভিতে খবর শুনল। দেশ-বিদেশের খবর শেষ করে বলল, তোরো-চৌদ্দ বছরের একটা ছেলে ছাদ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যা করার আগে সে ইন্টারনেটে কয়েকজনের সাথে লিখে লিখে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদেরকে বলেছে এখন তার আত্মহত্যা করতে হবে। সবাই ভেবেছিল ঠাট্টা করছে কিন্তু দেখা গেল ঠাট্টা নয়।

খবরটা শুনে শিরীনের মনটা খারাপ হয়ে যায়। বয়োসন্ধির সময়ে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি কিশোর-কিশোরী আত্মহত্যা করে। কিন্তু যারা আত্মহত্যা করে তারা তো হঠাৎ করে সিদ্ধান্তটি নেয় না, দীর্ঘদিনে ধীরে ধীরে একটা প্রস্তুতি নেয়। ছেলেটির পরিবারের কেউ কি ছিল না যে সেটা বোঝার চেষ্টা করতে পারত। সবার সাথেই কি একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছিল ? তপু যখন আরেকটু বড় হয়ে বয়োসন্ধিতে পৌঁছাবে তখন কী তার সাথেও এরকম একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে যাবে ? শিরীন তপুর ঘরে গিয়ে খানিকক্ষণ তার ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল,

ছেলেটির চেহারায় এমনিতেই একটি নির্দোষ সারল্যের ভাব আছে, যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সেটা আরো একশগুণ বেড়ে যায়। শিরীন নিচু হয়ে তপুর গালে একটা চুমু খেয়ে মশারিটা ভালো করে গুঁজে দিয়ে লাইটটা নিভিয়ে দিয়ে বের হয়ে এল।

অফিসে যাওয়ার আগে তপুর সাথে নাস্তা খাওয়ার সময় খবরের কাগজে চোখ বুলাতে গিয়ে শিরীনের আবার মন খারাপ হয়ে গেল। গতকাল যে-ছেলেটি আত্মহত্যা করেছে তার ছবি ছাপা হয়েছে। ফুটফুটে বুদ্ধিদীপ্ত একটা কিশোর। পাশে আরেকটা ছবি, ছেলের মৃতদেহের উপর মা আকুল হয়ে কাঁদছে। খবরের কাগজের মানুষগুলো কেমন করে এরকম ছবিগুলো ছাপায় ? তাদের বুকের ভিতরে কি কোনো অনুভূতি নেই ?

সপ্তাহখানেক পর দৈনিক প্রথম খবরে হাসান জামিল নামে একজন 'দুর্বোধ্য কৈশোর' নামে একটি বড় প্রতিবেদন লিখল। গত মাসখানেকের মাঝে কমবয়সী কিশোর-কিশোরী নিয়ে অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে, ঘটনাগুলো সত্যিই অস্বাভাবিক এবং দুর্বোধ্য। একজন খুন করেছে, আরেকজন খুন করার চেষ্টা করেছে। দুজন আত্মহত্যা করেছে, তিনজন নিখোঁজ। অন্তত ডজনখানেক কিশোর-কিশোরী অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেছে। এ ছাড়াও বড় একটা সংখ্যার কিশোর-কিশোরী কোনো একটি অজ্ঞাত কারণে একধরণের বিষন্নতায় ভুগছে। ঠিক কি কারণ কেউ জানে না। এই কিশোর-কিশোরীদের সবাই সচ্ছল পরিবারের, তুলনামূলকভাবে সবাই পড়াশোনায় ভালো, মেধাবী। সবাই শহরের ছেলেমেয়ে, একটা বড় অংশ খানিকটা নিঃসঙ্গ। হাসান জামিল নামক ভদ্রলোক ব্যাপারটি নানাভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে কিন্তু কোনভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারেনি। বেপরোয়া নগরজীবন, ড্রাগস, নিঃসঙ্গতা, পারিবারিক অশান্তি, পাশ্চাত্য জগতের প্রলোভন, টেলিভিশন, প্রেম-ভালোবাসা কিছুই বাকী রাখেনি, কিন্তু হঠাৎ করে কেন এতগুলো কিশোর-কিশোরীর এ-ধরনের একটা পরিণতি হচ্ছে তার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে দিতে পারেনি।

শিরীন প্রতিবেদনটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ল, এবং ঠিক কী কারণ জানা নেই পড়ার পর থেকে সে কেমন যেন শঙ্কা অনুভব করতে থাকে। দুর্বোধ্য কিশোর-কিশোরীর যে প্রোফাইলটা দেয়া হয়েছে তার সাথে তপুর কেমন যেন একটা মিল রয়েছে। সবচেয়ে যেটা ভয়ের কথা, ইদানিং শিরীনের মনে হচ্ছে তপুর সাথে তার কেমন জানি একটা দূরত্বের সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে।

রাত্রে খাবার-টেবিলে শিরীন ইচ্ছে করে তপুর সাথে একটু বেশি সময় নিযে কথা বলল, তার স্কুলের, বন্ধুবান্ধবের খোঁজখবর নিল। শিরীন লক্ষ্য করল তপুকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে কিন্তু নিজে থেকে কিছু বলছে না। মনে হচ্ছে খানিকটা অন্যমনস্ক - প্রশ্ন করলেও মাঝে মাঝে উত্তর দিতে দেরি হচ্ছে, প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার করতে হচ্ছে। শিরীন কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, "কী হয়েছে তোর ? কথা বলছিস না কেন ?"

"কে বলেছে কথা বলছি না ?"

"দশটা প্রশ্ন করলে একটা উত্তর দিচ্ছিস। কী হয়েচে ?"

"কিছু হয় নাই।"

শিরীন লক্ষ্য করল তপু জোর করে কথা বলার চেষ্টা করছে কিন্তু কথায় যেন প্রাণ নেই। জোর করে, চেষ্টা করে কষ্ট করে বানিয়ে বানিয়ে বলছে। বলার ইচ্ছে করছে না কিন্তু শিরীনকে খুশি করার জন্যে বলছে।

রাত্রে ঘুমানোর আগে শিরীন তপুর ঘরে গিয়ে দেখে সে কম্পিউটারের মনিটরের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে। মনিটরে বিচিত্র একটি নকশা খুব ধীরে ধীরে নড়ছে, তার সাথে সাথে স্পিকার থেকে খুব হালকা একটি সঙ্গীত ভেসে আসছে। তপুর দৃষ্টি সম্মোহিত, মুখ অল্প খোলা। কিছু একটা দেখে যেন সে ভারি অবাক হয়েছে, নিচের ঠোঁট অল্প অল্প নড়ছে। শুধু তাই নয়, শিরীন অবাক হয়ে দেখল, তপু ফিসফিস করে কিছু-একটা বলছে, যেন অদৃশ্য কারো সাথে কথা বলছে। শিরীন কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল, চাপা গলায় ডাকল, "তপু।"

তপু শুনতে পেল বলে মনে হয় না, শিরীন তখন আবার ডাকল, "তপু।" আগের থেকে জোরে ডেকেছে, তপু তবুও ঘুরে তাকাল না। শিরীন এবারে তপুকে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "তপু, এই তপু, কী হয়েছে তোর ?"

তপু খুব ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে শিরীনের দিকে তাকাল, শিরীন তার দৃষ্টি দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠে, শূন্য এবং অপ্রকৃতিস্থ একধরনের দৃষ্টি, শিরীনের দিকে তাকিয়েছে কিন্তু মনে হচ্ছে সে কিছু দেখছে না। শিরীন আবার চিৎকার করে তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকল, "তপু - এই তপু।"

তপু কাঁপা গলায় বলল, "কী !"

"কী হয়েছে তোর ?"

“তপু সম্মোহিতের মতো বলল, “কিছু হয়নি।“

“কার সাথে কথা বলছিস তুই ?“

“সেভারের সাথে।“

“সেভার ? সেভার কে ?“

“স্ক্রিন সেভার। লাউভ সেভার। নেট সেভার। সোল সেভার।“

শিরীন চিৎকার করে বলল, “কী বলছিস তুই পাগলের মতো ? তপু কী হয়েছে তোর ?“

তপু হঠাৎ করে যেন জেগে উঠল, অবাক হয়ে তাকাল শিরীনের দিকে, বলল, “কী হয়েছে আম্মু ?“

“তোর কী হয়েছে ?“

“আমার ? আমার কিছু হয়নি ?“

“তাহলে এখানে এভাবে বসে ছিলি কেন ? কার সাথে তুই কথা বলছিলি ?“

তপুকে হঠাৎ যেন কেমন বিভ্রান্ত দেখায়, কী যেন চিন্তা করে ভুরু কুঁচকে তারপর মাথা নেড়ে বলল, “মনে নেই আম্মু। কী যেন একটা খুব ইম্পরট্যান্ট একটা ব্যাপার। খুব জরুরি -“

শিরীন হঠাৎ করে কেমন জানি খেপে গেল, চিৎকার করে বলল, “বন্ধ কর কম্পিউটার। এক্ষুনি বন্ধ কর। বন্ধ কর বলছি।“

তপু কেমন জানি ভয় পেয়ে কম্পিউটার বন্ধ করে শিরীনের দিকে তাকাল। শিরীন হিংস্র গলায় বলল, “আর কোনদিন তুই কম্পিউটারের সামনে বসতে পারবি না। নেভার। বুঝেছিস ?“

তপু অবাক হয়ে শিরীনের দিকে তাকিয়ে রইল, সে যেন ঠিক বুঝতে পারছে না তার আম্মু কী বলছে।

রাতে ডাইনিং টেবিলে বসে শিরীন শুনতে পেল তপু ঘুমের মাঝে বিছানায় ছটফট করছে। মনে হয় বুঝি কোনো একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে। শিরীন তপুর মাথার কাছে বসে রইল, শেষপর্যন্ত যখন শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল তখন সে নিজের বিছানায় এল শোয়ার জন্যে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইল - তার চোখে কিছুতেই ঘুম আসছে না।

পরদিন দুপুরের পর শিরীন তাদের অফিসের সিস্টেম এডেমিনিস্ট্রেটর শাহেদ আহমেদকে খুঁজে বের করল। যে-কোন সিস্টেম এডমিনের মতোই শাহেদ কমবয়সী, উৎসাহী এবং হাসিখুশি মানুষ। শিরীনকে দেখে বলল, “কী হয়েছে আপা ? সিস্টেম ডাউন ?“

“না, না, সিস্টেম ঠিক আছে।“

“তাহলে ?“

“আপনি তো কম্পিউটার এক্সপার্ট, আপনাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি।“

“কী জিনিস ?“

শিরীন ইতস্তত করে বলল, “কম্পিউটার কী ছোট বাচ্চাদের উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারে ?“

“অবশ্যই পারে।“ শাহেদ উজ্জ্বল চোখে বলল, “কম্পিউটার হচ্ছে একটা টুল। এই টুলটা ব্যবহার করে কতকিছু করা যায়, কতকিছু শেখা যায় -“

“না, না -“ শিরীন মাথা নেড়ে বলল, “আমি ভালো প্রভাবের কথা বলছি না, খারাপ প্রভাবের কথা বলছি।“

শাহেদ এবার সরু চোখে শিরীনের দিকে তাকাল, বলল, “কীরকম খারাপ প্রভাব ?“

“ধরুন, পাগল হয়ে যাওয়া ?“

শাহেদ হেসে বলল, “না, সেরকম কিছু আমি কখনো শুনিনি।“

“কোনো কম্পিউটার গেম কী আছে যেটা খেললে বাচ্চাদের ক্ষতি হয় ?“

“সেটা তো থাকতেই পরে। আজকাল কী ভয়ানক ভয়ানক ভায়োলেন্ট গেম তৈরি করছে। এত গ্রাফিক যে সেগুলো খেলে খেলে বাচ্চারা ইনসেনসেটিভ হয়ে যেতে পারে। ভায়োলেন্সে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারে। গত বছর দুটি ছেলে আমেরিকার স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের গুলি করে মারল - তারা নাকি কী একটা কম্পিউটার গেম থেকে খুন করার আইডিয়াটা পেয়েছে।“

শিরীন ইতস্বত করে বলল, “কিন্তু কম্পিউটার গেম নয় - স্ক্রিন সেভার থেকে কি কোনো ক্ষতি হতে পারে ?“

শাহেদ হেসে বলল, “স্ক্রিন সেভারটা তৈরি হয়েছে স্ক্রিনের ফসফরকে বাঁচানোর জন্যে। কোনো একটা ডিজাইন, নকশা, এটা দেখে আর কী ক্ষতি হবে। তবে -“

“তবে ?“

“যাদের এপিলেপ্সি আছে তাদেরকে কম্পিউটার গেম খেলতে নিষেধ করে। কোথায় নাকি স্টাডি করে দেখেছে মনিটরের ফ্লিকার দেখে তাদের সিজ্যুর ট্রিগার করতে পারে। আমি নিজে দেখিনি, শুনেছি।“

শাহেদ কথা থামিয়ে একটু অবাক হয়ে বলল, “হঠাৎ আপনি এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন ?“

শিরীন পুরো ব্যাপারটি খুলে বলবে কি না চিন্তা করল, কিন্তু হঠাৎ তার কেমন জানি সংকোচ হল। সে মাথা নেড়ে বলল, “না, এমনিই জানতে চাচ্ছিলাম।“

শাহেদের সাথে কথা বলে শিরীন নিজের টেবিলে এসে দীর্ঘসময় চুপচাপ বসে থাকে। তার মাথায় কয়দিন থেকেই একটা সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে। যতই সময় যাচ্ছে ততই সন্দেহটা আরো প্রবলভাবে নিজের উপর চেপে বসছে। শেষ পর্যন্ত সে সন্দেহটা মিটিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল, ডাইরি থেকে টেলিফোন নাম্বার বের করে দৈনিক প্রথম খবরে ফোন করে হাসান জামিলের সাথে কথা বলতে চাইল। কিছুক্ষণের মাঝেই টেলিফোনে একজনের ভারী গলা শুনতে পেল, “হ্যালো। হাসান জামিল।“

শিরীন এর আগে কখনো খবরের কাগজের অফিসে ফোন করেনি, খনিকটা দ্বিধা নিয়ে বলল, “আপনি আমাকে চিনবেন না, আমি আপনাদের পত্রিকার একজন পাঠক।“

“জ্বি। কী ব্যাপার ?“

“বেশ কয়েকদিন আগে আপনি আপনাদের পত্রিকায় ‘দুর্বোধ্য কৈশোর‘ নামে একটা প্রতিবেদন লিখেছিলেন।“

“হ্যাঁ লিখেছিলাম। অনেক টেলিফোন কল পেয়েছিলাম তখন।“

“আমিও সেটা নিয়ে কথা বলতে চাইছি।“ শিরীন একটু ইতস্তত করে বলল, “সেই ব্যাপার নিয়ে আমি একটা জিনিস জানতে চাইছি।“

“কী জিনিস ?“

“আপনি যেসব কিশোর-কিশোরীর কথা লিখেছেন, আই মিন যারা খুন করেছে বা আত্মহত্যা করেছে বা অন্যভাবে ডিস্টার্বড তাদের কী কোনোভাবে কম্পিউটারের সাথে সম্পর্ক আছে ? মানে তারা কী এর আগে কোনোভাবে কম্পিউটার দিয়ে প্রভাবিত হয়েছে ?“

হাসান জামিল টেলিপোনের অন্যপাশে দীর্ঘসময় চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলল, “খুব অবাক ব্যাপার যে আপনি এটা জিজ্ঞেস করলেন। ব্যাপারটা আমরাও লক্ষ্য করেছি - যারা যারা ডিস্টার্বড সবাই কম্পিউটারে অনেক সময় দেয়, কিন্তু সেটাকে আমরা কোনো কো-রিলেশন হিসেবে ধরিনি।“

“কেন ধরেননি ?“

“মনে করুন সবাই তো নিশ্চয়ই সকালে নাস্তা করে, দুপুরে ভাত খায়, তাহলে কি বলব যারা সকালে নাস্তা করে বা দুপুরে ভাত খায় তারা সকলেই ডিস্টার্বড।“

শিরীন একটু ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, “এটা খুব বাজে যুক্তি।“

“যুক্তি পছন্দ না হলেই আপনারা বলেন বাজে যুক্তি।“

“আপনি যেসব কিশোর-কিশোরীর কথা লিখেছেন তাদের সবাই কি ঘটনার আগে আগে কম্পিউটারের কোনো একটা বিশেষ জিনিস নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে ছিল না ? সামথিং ভেরি স্পেসিফিক ?“

হাসান জামিল আমতা আমতা করে বললেন, “ইয়ে সেরকম একটা কথা আমরা শুনেছি। কনফার্ম করতে পারি নি -“

“সাংবাদিক হিসেবে আপনাদের কি দায়িত্ব ছিল না কনফার্ম করা ?“

“দেখুন আমরা সাংবাদিক, তার অর্থ এই নয় যে আমরা সমাজের বাইরে। সমাজের প্রতি আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। আমরা চেষ্টা করছি দেশকে তথ্যপ্রযুক্তিতে এগিয়ে নিতে। এখন যদি কম্পিউটার নিয়ে একটা ভীতি ছড়িয়ে দিই - অকারণ ভীতি -“

“অকারণ ভীতি ? অকারণ ?“

“যেটা প্রমানিত হয়নি -“

“আপনারা প্রমান করার চেষ্টা করেননি -“

হাসান জামিল আবার আমতা আমতা করে কিছু-একটা বলতে চাইছিল কিন্তু শিরীনের আর কিছু শোনার ধৈর্য থাকল না। সে রেগেমেগে টেলিফোনটা রেখে গুম হয়ে টেবিলে বসে রইল।

একটা চাপা দুশ্চিন্তা নিয়ে শিরীন বাসায় ফিরে এসে দেখে তপু বসে বসে হোমওয়ার্ক করছে। শিরীনকে দেখে হাত তুলে বলল, "আম্মু, তুমি এসেছ !"

"হ্যাঁ বাবা। তোর কী খবর ?"

"বাংলা খবর -" বলে তপু হি হি করে হাসল। এটা একটা অত্যন্ত পুরাতন এবং বহুলব্যবহৃত রসিকতা, তবুও শুনে শিরীনও হাসল এবং হঠাৎ করে তার মন ভালো হয়ে গেল। শিরীন তপুর মাথার চুল এলোমেলো করে দিয়ে খানিকক্ষণ এটা-সেটা নিয়ে কথা বলে আসল প্রসঙ্গে চলে এল। বলল, "তপু।"

"কী আম্মু।"

"আমি ঠিক করেছি তুই এখন কয়েকদিন কম্পিউটার ব্যাবহার করতে পারবি না।"

শিরীন ভেবেছিল তপু নিশ্চয়ই চিৎকার করে আপত্তি করবে, নানারকম ওজর-আপত্তি তুলবে, নানা যুক্তি দেখাবে। কিন্তু সে কিছুই করল না, অত্যন্ত বাধ্য ছেলের মতো মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে আম্মু।"

গভীর রাতে হঠাৎ শিরীনের ঘুম ভেঙে গেল। ঠিক কেন ঘুম ভেঙেছে সে বুঝতে পারল না, তার শুধু মনে হল খুব অস্বাভাবিক কিছু-একটা ঘটছে কিন্তু সেটা কি সে বুঝতে পারছে না। সে চোখ খুলে তাকাল, তার মনে হলো সারা বাসায় হালকা নীল একটা আলো। শুধু তাই নয়, মনে হল খুব চাপাস্বরে কেউ একজন কাঁদছে, ইনিয়ে বিনিয়ে কান্না। শিরীন ধড়মড় করে উঠে বসল। আলোটা মনের ভুল নয়, সত্যিই হালকা নীল রঙের একটা আলো। কিসের আলো এটা ?

শিরীন বিছানা থেকে নেমে নিজের ঘর থেকে বের হতেই দেখল তপুর ঘরের দরজা আধখোলা, আলোটা তার ঘর থেকে আসছে। শিরীন প্রায় ছুটে সেই ঘরে ঢুকে আলোর উৎসটা

আবিষ্কার করল, কম্পিউটারের মনিটরের আলো। মনিটরে বিচিত্র একটা ছবি, সেটি ধীরে ধীরে নড়ছে এবং স্পিকার থেকে চাপা কান্নার মতো একটা শব্দ হচ্ছে - মনে হচ্ছে ঝড়ো বাতাসের শব্দ, তার মাঝে কেউ একজন ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। মনিটরের অপার্থিব নীল আলোতে তপুর ঘরটিকে একটি অপার্থিব জগতের দৃশ্য বলে মনে হচ্ছে। শিরীন অবাক হয়ে তপুর বিছানার দিকে তাকাল, বিছানার এককোণায় তপু গুটিশুটি মেরে বসে মনিটরটির দিকে তাকিয়ে থরথর করে কাঁপছে। শিরীন কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, “কী হয়েছে তোর, তপু ? কী হয়েছে ?“

তপু কাঁদতে কাঁদতে বলল, “ভয় করছে আম্মু। আমার খুব ভয় করছে।“

“ভয় কী বাবা ? তোর ভয় কিসের ?“

শিরীন ঘরের লাইট জ্বালিয়ে তপুর কাছে এগিয়ে যায়। মশারি তুলে তপুর কাছে গিয়ে বসল। হাঁটুর ওপরে মুখ রেখে বসেছে, চোখ থেকে পানি বের হয়ে গাল ভিজে আছে। চোখের দৃষ্টি অপ্রকৃতিস্থের মতো, একধরনের আতঙ্ক নিয়ে মনিটরটির দিকে তাকিয়ে আছে। হাতদুটি পিছনে, অত্যন্ত বিচিত্র একটি বসে থাকার ভঙ্গি। শিরীন তপুর পিঠে হাত রেখে বলল, “তোকে না কম্পিউটার চালাতে নিষেধ করেছিলাম ?“

“আমি চালাইনি আম্মু। বিশ্বাস করো আমি চালাইনি।“

“তাহলে কে চালিয়েছে ?“

তপু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, “আমি জানি না।“

“ঠিক আছে বাবা, কম্পিউটার বন্ধ করে দিচ্ছি।“

তপু হঠাৎ চিৎকার করে বলল, “না।“

“না !“ শিরীন অবাক হয়ে বলল, “কেন না ?“

“আমার ভয় করে আম্মু - আমি বলতে পারব না -“

শিরীন অবাক হয়ে তপুর পিঠে হাত বুলিয়ে হাতটা নিচে আনতেই হঠাৎ সেখানে একটা ধাতব শীতল স্পর্শ অনুভব করল। পিছনে তাকাতেই সে অবাক হয়ে দেখল তপু দুই হাতে একটা চাকু ধরে রেখেছে। রান্নাঘরে এই চাকু দিয়ে সে শাকসব্জি কাটে। শিরীনের মেরুদণ্ড দিয়ে ভয়ের একটা শীতল স্রোত বয়ে যায় এবং কিছু বোঝার আগে হঠাৎ করে তপু দুই হাতে চাকুটা উপরে তুলে শিরীনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করল।

শিরীন প্রস্তুত ছিল বলে ঝটকা মেরে একপাশে সরে গেল এবং তপুর চাকুটা বিছানার ভেতরে ঢুকে গেল। শিরীন চিৎকার করে তপুর হাতটা খপ করে ধরে ফেলল কিন্তু অবাক হয়ে আবিষ্কার করল এইটুকু মানুষের শরীরে ভয়ঙ্কর জোর। তপু হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দিয়ে আবার চাকুটা উপরে তুলে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলে বলল, "আম্মু আমি মারতে চাই না আম্মু - কিন্তু আমি কী করব। আমাকে বলেছে মারতেই হবে -" তপু কথা শেষ করার আগেই আবার চাকুটি নিয়ে শিরীনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শিরীন ঝটকা মেরে আবার সরে গিয়ে টেবিলের নীচে ঢুকে গেল। ভয়ংকর আতঙ্ক নিয়ে দেখল তপু চাকুটা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছে। সে ভেউ ভেউ কাঁদছে - কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে আসছে, তার কিছু করার নেই, তাকে কেউ একজন আদেশ দিচ্ছে সেই আদেশ সে অমান্য করতে পারবে না।

শিরীন দেখল তপু আরো একটু এগিয়ে এসেছে, ঠিক তখন সে কম্পিউটারের পাওয়ার কর্ডটা টান দিয়ে খুলে ফেলল। একটা চাপা শব্দ করে মনিটরটি অন্ধকার হয়ে গেল এবং সাথে সাথে তপু মাটিতে টলে পরে গেল। শিরীন কাছে গিয়ে দেখে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। তপুকে বুকে চেপে ধরে সে বের হয়ে আসে, হামাগুড়ি দিয়ে সে টেলিফোনের কাছে ছুটতে থাকে - তাকে হাসপাতালে নিতে হবে। তাকে বাঁচাতে হবে।

মাসখানেক পরের কথা। শাহেদের রুমে শিরীন তার সাথে কথা বলছে। শাহেদ হাসিমুখে বলল, "আপনার অনুমান সত্যি। আপনার কথা বিশ্বাস করলে আরো অনেক মানুষকে বাঁচানো যেত।"

শিরীন কোন কথা বলল না। শাহেদ বলল, "কিন্তু ব্যাপারটি বিশ্বাস করবে কীভাবে ? এটা তো বিশ্বাস করার কথা নয়। একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম বাচ্চাদের সম্মোহিত করে ভয়ংকর ব্যাপার ঘটাচ্ছে, এটা কি বিশ্বাস করা যায় ?"

শিরীন মাথা নাড়ল। বলল, "তা যায় না।"

"আপনার ছেলে এখন কেমন আছে ?"

"ভালো। প্রতিদিন বিকেলে এখন আমি ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিই খেলার জন্যে। দৌড়াদৌড়ি করার জন্যে।"

“ভেরি গুড। ঐ রাতের ঘটনা কিছু মনে করতে পারে?“

“না, পারে না। আমি চাইও না তার মনে পড়ুক।“

শাহেদ হাসার চেষ্টা করে বলল, “ঠিকই বলেছেন।“

শিরীন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, “ঐ স্ক্রিন সেভারটা কে তৈরি করেছে সেটা কি বের করতে পেরেছে?“

শাহেদ মাথা নাড়ল, বলল, “না। অনেক চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু এখনও বের করতে পারে নি। স্ক্রিন সেভারটা এত অদ্ভূত এত অস্বাভাবিক যে সবাই একটা অন্য জিনিস সন্দেহ করছে।“

“কি সন্দেহ করছে?“

“এটা কোনো মানুষ লিখেনি।“

“তাহলে কে লিখেছে?“

“ইন্টারনেট।“

“ইন্টারনেট?“

“হ্যাঁ - ইন্টারনেট হচ্ছে অসংখ্য কম্পিউটারের একটা নেটওয়ার্ক - ঠিক মানুষের মস্তিষ্কের মতো। অনেকে মনে করছে পৃথিবীর ইন্টারনেটের বুদ্ধিমত্তা এখন মানুষের বুদ্ধিমত্তা থেকে বেশি।“

“মানে?“

“তার মানে মানুষ নেটওয়ার্ককে নিয়ন্ত্রন করছে না। নেটওয়ার্কই মানুষকে নিয়ন্ত্রন করছে।“

শিরীন চমকে উঠে বলল, “কী বলছেন আপনি!“

“হ্যাঁ। সবাই ধারনা করছে এই স্ক্রিন সেভারটি ছিল তাদের প্রথম চেষ্টা - পরের বার আক্রমনটা হবে আরো পরিকল্পিত। আরো ভয়াবহ।“

শিরীন কোনো কথা না বলে চোখ বড় বড় করে শাহেদের দিকে তাকিয়ে রইল।

চিড়িয়াখানা

"তোমাকে দেখার আমার একটু কৌতুহল ছিল -" বলে হাজীব কুন্তেরা, রাহান জাবিলের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। হাজীব কুন্তেরার চেহারায় বিচিত্র একধরনের নিষ্ঠুরতা রয়েছে। এই হাসিটি হঠাৎ করে সেই নিষ্ঠুরতাটিকে কেন জানি খোলামেলাভাবে প্রকাশ করে দিল।

রাহান জাবিল হঠাৎ করে একধরনের আতঙ্ক অনুভব করে, এই মানুষটির আমন্ত্রণ রক্ষা করে এখানে আসা হয়তো খুব বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। সে বেশ চেষ্টা করে মুখে একধরনের বেপরোয়া এবং শান্তভাব ধরে রেখে জিজ্ঞেস করল, "কেন ? আমাকে দেখার তোমার কৌতুহল কেন ?"

"আমি পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মানুষ। ইচ্ছে করলে আমি মাঝারি একটা দেশের রাষ্ট্রপতি পাল্টে দিতে পারি। আমাকে নিয়ে খবরের কাগজে রিপোর্ট লিখে সেই মানুষটি কেমন দেখার কৌতুহল।"

"আমি একজন সাংবাদিক। সত্যকে প্রকাশ -" রাহানের বক্তৃতাটি মাঝপথে থামিয়ে হাজীব কুন্তেরা বলল, "থাক।"

রাহান খানিকটা অপমানিত বোধ করে কিন্তু হঠাৎ করে যে-কোন মূল্যে সত্যকে প্রকাশ করার সাংবাদিকদের বিশেষ দায়িত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা দেয়ার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

হাজীব কুন্তেরা টেবিলে তার আঙ্গুল দিয়ে শব্দ করতে করতে বলল, "আমি যা ভেবেছিলাম তুমি ঠিক তাই।"

রাহান ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "সেটি কী ?"

"কমবয়সী, অপরিপক্ক, নির্বোধ এবং আহাম্মক।"

রাহান হতভম্ব হয়ে মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইল। একজন মানুষ যত বিত্তশালীই হোক, যত ক্ষমতাবানই হোক, সে কি অন্য একজনের সাথে এই ভাষায় কথা বলতে পারে !

রাহান কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিল, হাজীব আবার হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল, বলল, "রাগ করো না। তোমার বয়সে আমিও নির্বোধ এবং আহাম্মক ছিলাম।"

রাহান ক্রুদ্ধ গলায় বলল, "আমি নির্বোধ এবং আহাম্মক নই।"

হাজীব রাহানের কথার উত্তর না দিয়ে অত্যন্ত বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসল এবং হঠাৎ করে রাহান বুঝতে পারল সে আসলেই নির্বোধ এবং আহাম্মক। সে খানিকক্ষণ একধরনের অক্ষম আক্রোশ নিয়ে হাজীবের সবুজ চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "তুমি কেন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ ?"

"কথা বলার জন্যে।"

রাহান ভুরু কুঁচকে বলল, "কথা বলার জন্যে ?"

"হ্যাঁ। আমার আসলে কথা বলার লোক নেই।"

"কথা বলার লোক নেই ?"

"না। যারা আমার কর্মচারী তারা কখনো আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার সাহস পায় না। যারা পরিচিত তারা তোষামুদি করে।"

"তোমার আপনজন ?"

"আমার কোনো আপনজন নেই।"

রাহান ভুরু কুঁচকে বলল, "আমি তোমার উপর রিপোর্ট করেছি, আমি জানি তোমার দুইজন স্ত্রী আছে, তিনজন ছেলেমেয়ে আছে।"

হাজীব এবারে শব্দ করে হাসল, এই হাসিটি হল শ্লেষে পরিপূর্ণ এবং সে-কারণে মানুষটিকে অত্যন্ত কুশ্রী দেখাল। রাহান মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে একধরনের ঘৃণা অনুভব করে। হাজিব হাসি থামিয়ে বলল, "আমার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে প্রতিমুহূর্তে আমার মৃত্যু কামনা করে।"

"কেন ?"

"তুমি সাংবাদিক, এটা তোমার জানার কথা।"

রাহান কোন কথা বলল না, সে আসলেই জানে। ছোটখাটো সম্পদ মানুষের জীবনে সুখ আনতে পারে, ভয়ংকর ঐশ্বর্যের বেলায় সেটি সত্যি নয়, পারিবারিক জীবনটিকে সেটি কুৎসিত ষড়যন্ত্রে পাল্টে দেয়।

হাজীব বলল, "আমি আমার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েকে নিয়ে তোমার সাথে কথা বলতে চাই না।"

"তাহলে কী নিয়ে কথা বলতে চাও ?"

"তোমাকে নিয়ে।"

রাহান অবাক হয়ে বলল, “আমাকে নিয়ে ?“

“হ্যাঁ।“

“আমাকে নিয়ে তুমি কী কথা বলতে চাও ?“

হাজীব তার ডেস্ক থেকে একটা খবরের কাগজ বের করে টেবিলে রেখে বলল, “এখানে তুমি আমার সম্পর্কে একটা বিশাল আলোচনা ফেঁদেছ।“

না-তাকিয়েও রাহান বুঝতে পারে হাজীব কোন লেখাটার কথা বলছে, একটি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত দৈনিক পত্রিকায় তার এই নিবন্ধটি ছাপা হয়েছিল। হাজীবের টাকার উৎস, তার নানা ধরনের অপরাধ, তার অমানবিক নৃশংসতা কিছুই সে বাদ দেয়নি। হাজীব চেষ্টা করে মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে বলল, “তুমি এখানে আমার চরিত্রটি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছ।“

রাহান মাথা নাড়ল। হাজীব বলল, “তুমি আমার সম্পর্কে কতটুকু জানো ?“

“পৃথিবীতে তোমার সম্পর্কে যত তথ্য আছে আমি তার সব জোগাড় করে বিশ্লেষণ করেছি।“

“আমি মানুষটা কেমন বলে তোমার ধারণা ?“

রাহান একটু ইতস্তত করে বলল, “খারাপ।“

“কত খারাপ ?“

“বেশ খারাপ।“

“সেটা কতটুকু সে সম্পর্কে তোমার ধারণা আছে ?“

রাহান কোন কথা না বলে হাজীবের দিকে তাকিয়ে রইল। হাজীব একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, “আমার ধারণা সে সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই।“

হাজীব ঠিক কি বলতে চাইছে রাহান সেটা অনুমান করার চেষ্টা করল কিন্তু খুব একটা লাভ হল না। সে কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই হাজীব উঠে দাঁড়াল, বলল, “চলো।“

“কোথায় ?“

“এখানে একটা চিড়িয়াখানা আছে, তোমাকে সেটা দেখাব।“

“চিড়িয়াখানা !“ রাহান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, “তোমার নিজস্ব চিড়িয়াখানা আছে ?“

“হ্যাঁ। বড়লোকদের অনেক রকম খেয়াল থাকে। কেউ মূল্যবান রত্ন সংগ্রহ করে, কেউ দুষ্প্রাপ্য ছবি সংগ্রহ করে - আমি সেরকম দুষ্প্রাপ্য প্রাণী সংগ্রহ করি।“

“দুষ্প্রাপ্য প্রাণী ?“

“হ্যাঁ।“

“কীরকম দুষ্প্রাপ্য ?“

“আমার কাছে যেগুলো আছে, মনে করো সেগুলো পৃথিবীর কারো কাছে নেই !“

সেটি কিভাবে সম্ভব রাহান বুঝতে পারল না। তাহলে কী সে জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাবহার করে নূতন ধরনের প্রাণী তৈরি করেছে ? প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করতে গিয়ে সে থেমে গেল - এক্ষুনি হয়তো ব্যাপারটি সে নিজের চোখেই দেখতে পাবে।

হাজীব-এর পিছনে পিছনে রাহাব বের হয়ে এল, পিছনে পিছনে কয়েকজন প্রহরী বের হয়ে আসবে বলে রাহান অনুমান করেছিল কিন্তু সেরকম কিছু হল না। মানুষটি নিরাপত্তা নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামায় না, সম্ভবত নান ধরনের গোপন ক্যামেরা দিয়ে তাদেরকে চোখে চোখে রাখা হয়েছে।

প্রাসাদের মতো দালানটির মার্বেল সিঁড়ি-দিয়ে তারা নেমে এল। সিঁড়ির সামনে ছোট একটি গাড়ি রাখা আছে, পাশাপাশি দুজন বসতে পারে। হাজীব রাহানকে ইঙ্গিত করে নিজে অন্যপাশে বসে একটা সুইচ স্পর্শ করতেই গাড়িটি একেবারে নিঃশব্দে চলতে শুরু করল, রাহান কান পেতে অনেক চেষ্টা করেও গাড়ির ইঞ্জিন বা মোটরের শব্দ শুনতে পেলো না। গাড়িটি খুব ধীরে ধীরে চলছে, কোন দিক দিয়ে যেতে হবে নিশ্চয়ই প্রোগ্রাম করে রাখা আছে। গাড়িগটির ছাদ নেই বলে খুব খোলামেলা, চারিদিকে দেখা যায়। হাজীব সিটে হেলান দিয়ে বলল, “সারা পৃথিবীতে আমার একচল্লিশটা দ্বীপ আছে, তবে এটা আমার সবচেয়ে প্রিয়।“

“এটা কত বড় ?“

“খুব বেশি বড় নয়। একশ বর্গ কিলোমিটার থেকে একটু ছোট।“

“এখানে তোমার নিজস্ব এয়ার স্ট্রিপ আছে ?“

হাজীব হাত নেড়ে বলল, “সেজন্য এটি আমার প্রিয় নয়। আমার প্রিয় কারণ এই পুরো দ্বীপটি আসলে একটা সুপ্ত আগ্নেয়গিরি।“ হাজীব হাত দিয়ে দূরে দেখিয়ে বলল, “ওখানে গ্রানাইটের পাহাড়, ভারি চমৎকার।“

বৃক্ষহীন গ্রানাইটের পাহাড় কেমন করে ভারি চমৎকার হতে পারে রাহান বুঝতে পারল না, কিন্তু সে কোনো প্রশ্নও করল না। তবে জায়গাটি আশ্চর্য রকম নির্জন, কোথাও কোনো মানুষজন নেই। চিড়িয়াখানাটি কোথায় কে জানে, রাহান বিচিত্র একধরনের কৌতুহল নিয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে থাকে।

গ্রানাইটের পাহাড়ের খুব কাছাকাছি এলে হঠাৎ এক ধরনের সুরঙ্গ দেখতে পেল, ছোট গাড়িটি সেই সুরঙ্গ দিয়ে ভিতরে একটা খোলা জায়গায় এসে হাজির হয়। হাজীব তখন সুইচ টিপে গাড়িটি থামিয়ে দিয়ে বলল, "এটা আমার চিড়িয়াখানা।"

রাহান চারিদিকে তাকিয়ে চিড়িয়াখানার কোন চিহ্ন দেখতে পেল না। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে হাজীবের দিকে তাকাতে হাজীব বলল, "এদিকে এসো।"

রাহান হাজীবের পিছু পিছু একদিকে এগিয়ে যায়, উঁচু পাহাড়ের খাড়া দেয়াল উঠে গেছে, সেখানে হাত দিয়ে একটা পাথর সরাতেই উঁকি দেয়ার মতো একটা জায়গা বের হয়ে গেল। হাজীব সেখানে উঁকি দিয়ে কিছু একটা দেখে সরে গিয়ে বলল, "দেখো।"

রাহান কৌতুহলী হয়ে তাকিয়ে চমকে উঠে। বেশ খানিকটা দূরে নিচে খানিকটা সমতল জায়গায় বিচিত্র কয়েকটা প্রাণী একটি মৃত ছাগলের দেহ টানাটানি করে খাচ্ছে। কামড়াকামড়ি করে খেতে-খেতে হঠাৎ একটা অন্যটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তুলনামূলকভাবে দূর্বল প্রাণীটি চারপায়ে ছুটে দূরে চলে গিয়ে অক্ষম আক্রোশে গর্জন করতে লাগল। প্রাণীটির সিংহের মতো লম্বা কেশর এবং পিছনের দুই পা তুলনামূলকভাবে লম্বা। দেখে মনে হয় কোনো একধরনের অপুষ্টির কারণে দেহের লোম ঝরে গেছে। মুখমণ্ডল গোলাকার এবং বানর বা মানুষের সাথে মুখমণ্ডলের মিল রয়েছে। রাহান একটু অবাক হয়ে হাজীবের দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, "এটি কোন প্রাণী ?"

হাজীব মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "মানুষ।"

রাহান বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠে এবং আবার মাথা ঘুরিয়ে ছোট ফুটো দিয়ে উঁকি দিল এবং আতঙ্কে শিউরে উঠে আবিষ্কার করল সত্যিই এই প্রাণীগুলো মানুষ। সে ফ্যাকাশে মুখে হাজিবের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই মানুষগুলো এরকম কেন ?"

"আমি আইডিয়াটি পেয়েছিলাম একটি বিশেষ ঘটনা থেকে। প্রাচীন ভারতবর্ষে একটি নেকড়ে বাঘের গর্তে দুটি মেয়ে পাওয়া গিয়েছিল। একটির বয়স ছিল সাত-আট, অন্যটি আরো

একটু বড়, বারো-তেরো। নেকড়ে বাঘ তাদেরকে গ্রাস থেকে ধরে এনে বড় করেছিল। মানুষেরা তাদের উদ্ধার করে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু কোন লাভ হয়নি। শৈশব নেকড়ে বাঘের সঙ্গে কাটানোর জন্যে তারা বন্যপশুর মতোই থেকে গিয়েছিল। মানুষের কোনো বৈশিষ্ট ছিল না। চারপায়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটত, কাচা মাংস খেত গায়ে কাপড় রাখত না, তীক্ষ্ণ ছিল ঘ্রাণশক্তি - এক কথায় পুরোপুরি বন্যপশু !"

হাজীব একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "মানুষের বাচ্চাদুটিকে উদ্ধার করে তাদের নাম দেয়া হয়েছিল অমলা আর কমলা। কিন্তু ঐটুকুই ছিল তাদের একমাত্র মানুষের পরিচয়।"

রাহান একধরনের আতঙ্ক নিয়ে হাজীবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। হাজীব মুখে তার সেই ভয়ঙ্কর অস্পষ্ট হাসিটা ফুটিয়ে বলল, "ঘটনাটি শুনে আমার মনে হয়েছিল ইতিহাসে যদি এরকম একটি ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে কি আমরা আরো তৈরি করতে পারি না ?"

রাহান হতচকিত হয়ে হাজীবের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি - তুমি এদের তৈরি করেছ ?"

"হ্যাঁ।" হাজিব মাথা নাড়ল, বলল, "কাজটি খুব সহজ হয়নি। অনেক শিশু নষ্ট হয়েছে। সব নেকড়ে-মাতাই যে মানবশিশুকে নিজের শিশুর হিসেবে বড় করতে চায় সেটা সত্যি নয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমরা পেরেছি - এখানে পাঁচটি নেকড়ে-মানব আছে। দুটি ছেলে, তিনটি মেয়ে। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি এদের সন্তানেরা কীরকম হয় দেখার জন্যে।"

রাহান ভয়ংকর একটি আতঙ্ক নিয়ে হাজীবের দিকে তাকিয়ে রইল। তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি কী সত্যিই মানুষ নাকি একটি দানব - হঠাৎ করে এই ব্যাপারটি নিয়ে তার সন্দেহ হতে থাকে।

হাজীব দুই পা হেঁটে বলল, "আমার মনে হল, মানবশিশু যদি নেকড়েকে দিয়ে পালন করানো যায়, তাহলে অন্য পশু কেন নয়। তখন আমি পরীক্ষা শুরু করেছি। বাঘ, কুকুর, শিম্পাঞ্জি এমনকি ডলফিন।"

"ডলফিন ?"

"হ্যাঁ। ঐপাশে পানির একটা ছোট হ্রদ আছে, সেখানে তিনজন ডলফিন শিশু থাকে। পানির নিচে সাঁতার কাটে, কাঁচা মাছ খায়। দেখে কেউ বলতেও পারবে না যে তারা আসলে ডাঙার প্রাণী ! আমি পুরো বিবর্তনকে উল্টোদিকে প্রবাহিত করতে শুরু করেছি !"

হাজীব শব্দ করে হাসল এবং রাহান হঠাৎ করে আবার আতঙ্কে শিউরে উঠল। হাজীব একটা বড় পাথরে বসে বলল, “যাও রাহান, তুমি ঘুরে ঘুরে দ্যাখো। আমি এখানে অপেক্ষা করি। আমার মনে হয় শিম্পাঞ্জি-শিশুটিকে তুমি পছন্দই করবে - দেখে মনে হয় বিবর্তনের ফলে মাটিতে নেমে আমরা বুদ্ধিমানের কাজ করিনি। গাছটাই বুঝি ভালো ছিল !“

রাহান শুষ্কমুখে বলল, “আমার দেখার ইচ্ছে করছে না।“

“না করলে কেমন করে হবে ? তুমি একজন অকুতোভয় ন্যায়নিষ্ঠ সাংবাদিক। তুমি এটি দেখবে না ? যাও, দেখে আসো। কারণ তুমি এই সবগুলো দেখে এলে আমি আমার সর্বশেষ আবিষ্কারটি দেখাব।“

“কী আবিষ্কার ?“

হাজীব মাথা নাড়ল, বলল, “সেটা আমি আগেই বলব না। রাহান তুমি বুঝতে পারছ না তুমি কত বড় সৌভাগ্যবান মানুষ। আমার এই চিড়িয়াখানায় এর আগে কোনো মানুষ আসেনি। এটি আমার খুব ব্যক্তিগত জায়গা। যখন কোনকিছু নিয়ে আমার খুব মেজাজ খারাপ হয় তখন আমি এখানে আসি। এই পশু-শিশুগুলো দেখলে আমার স্নায়ুগুলো নিজে থেকে শীতল হয়ে আসে। আমি মাঝে মাঝে এসে একসপ্তাহ-দুসপ্তাহও থাকি। ঐপাশে আমার একটা ছোট ঘর আছে। এটা হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত আনন্দভূমি। এখানে আজ আমি তোমাকে এনেছি - তুমি উপভোগ না করলে কেমন করে হবে ?“

রাহান মাথা নাড়ল, “না হাজীব - আমার পক্ষে এটা উপভোগ করা সম্ভব নয়।“

“কিন্তু তুমি সাংবাদিক - আমার সম্পর্কে তুমি যদি পূর্ণাঙ্গ একটা রিপোর্ট লিখতে চাও তাহলে কি পুরোটা দেখা উচিত নয় ?“

হাজীবের কথার শ্লেষটুকু ধরতে রাহানের কোনো অসুবিধে হল না এবং হঠাৎ করে সে এক অমানুষিক ধরনের আতঙ্কে শিউরে উঠে। হাজীব রাহানের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, “ঠিক আছে। তুমি যদি দেখতে না চাও তোমাকে আমি জোর করে দেখাতে পারব না। তবে আমার শেষ আবিষ্কারটি তোমাকে দেখতে হবে।“

“তোমার আবিষ্কারটি কী ?“

“বলতে পারো এ-ব্যাপারে আমার গুরু হচ্ছে ড. ম্যাঙ্গোলা। নাৎসি জার্মানির একজন ডাক্তার। মানুষকে নিয়ে সবচেয়ে সুন্দর পরীক্ষাগুলো করেছিলেন তিনি।“

"সুন্দর ?"

"হ্যাঁ। সাধারণ মানুষ ভিতু। জৈব পরীক্ষাগুলো করে পশুপাখিদের উপর। কিন্তু সরাসরি মানুষের উপর পরীক্ষা করার মতো আনন্দ আর কোথায় পাবে ? ড. ম্যাঙ্গোলা সেই পরীক্ষা করতেন। তাদের বিকলাঙ্গ করতেন, অত্যাচার করতেন। তার কোন সংকোচ ছিল না।"

রাহান নিশ্বাস আটকে বলল, "তুমিও করেছ ?"

"হ্যাঁ। আমি শুরু করেছি। প্রথম পরীক্ষাটি খুব সহজ। মানবশিশুদের যদি জন্মের পর থেকে অন্ধকারে রেখে দেয়া হয় তাহলে কী হবে ?"

"তুমি সেই পরীক্ষাটি করেছ ?"

"হ্যাঁ। একডজন শিশুকে আমি পুরোপুরি অন্ধকারে বড় করেছি। আলো কি তারা জানে না - তারা কখনো সেটা দেখেনি।"

"তুমি তাদের কেমন করে দ্যাখো ?"

"ইনফ্রা-রেড ক্যামেরা দিয়ে। এই দ্যাখো -"

হাজীব একটু এগিয়ে গিয়ে একটা সুইচ স্পর্শ করতেই বড় একটা স্ক্রিনে কিছু ছবি ভেসে উঠল। বড় বড় চুল, বড় বড় নখ, বুনো পশুর মতো নানা বয়সী কিছু মানুষ ইতস্তত হাঁটছে, মাটি থেকে খুঁটে খুঁটে খাবার খাচ্ছে, তাদের দৃষ্টিশক্তি নেই কিন্তু তারা সেটি জানে না।

"এই মানুষগুলোর স্পর্শশক্তি ভয়ঙ্কর প্রবল। ঘ্রাণশক্তিও অনেক বেশি। দৃষ্টিশক্তি ব্যবহার না করে থাকার মাঝে কোনো অসুবিধা আছে বলেই মনে হয় না।"

রাহান হঠাৎ করে ঘুরে হাজীবের দিকে তাকাল, বলল, "তুমি কেন আমাকে এসব দেখাচ্ছ?"

"কারণ আমি তোমাকে এখানে রেখে যাব।"

রাহান বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো চমকে উঠল, "কী বললে !"

"হ্যাঁ।

এই অন্ধকারের মানুষের কাছে আমি তোমাকে রেখে যাব। আমার খুব কৌতুহল একজন নূতন অতিথি পেলে তারা কী করে সেটা দেখার।"

"তুমি কী বলছ এসব !"

“ঠিকই বলছি। নির্বোধ আহাম্মক একটা সাংবাদিক একটা কাজে ব্যবহার করা যাক। কী বলো ?“

রাহান বিস্ফারিত চোখে দেখল হাজীবের হাতে ছোট একটা রিভলবার। হাজীব মুখে তার সেই ভয়ংকর হাসিটি ফুটিয়ে বলল, “তোমাকে এখনই ঠিক করতে হবে তুমি কী করবে ? একটু বাধা দিলেই আমি তোমাকে গুলি করব। এটি আমার জগৎ - এখানে আমি ছাড়া কেউ আসে না। কেউ জানবে না কী হয়েছে।“

হাজীব কথা শেষ করার আগেই রাহান তার উপর ঝাপিয়ে পড়ল এবং হাজীব এতটুকু দ্বিধা না করে রিভলবারের পুরো ম্যাগাজিনটি তার উপরে শেষ করল। গুলির শব্দ গ্রানাইটের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয় এবং পশু হিসেবে বেড়ে-ওঠা মানবশিশুগুলি আতঙ্কিত হয়ে ছুটোছুটি শুরু করে দেয়। রাহানের দেহ একটা বড় পাথরের ওপর ছিটকে পড়ে।

হাজীব একটা নিশ্বাস ফেলে রিভলবারটি তার পকেটে রেখে গাড়ির কাছে ফিরে যায়। সেখানে এক বোতল উত্তেজক পানীয় রাখা আছে, তার স্নায়ুকে শীতল করার জন্যে এখন সেটি দরকার। সে বহুদিন পর কাউকে নিজের হাতে খুন করল, একধরনের বিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করল হত্যাকাণ্ডের প্রক্রিয়াটিতে সে একধরনের প্রশান্তি অনুভব করেছে।

উত্তেজক পানীয়টির দ্বিতীয় ঢোক খাওয়ার পর হঠাৎ করে তার মনে একটি খটকা লাগল। রাহানের শরীরে ছয়টি গুলি লাগার পরও শরীরে সে-পরিমাণ রক্ত বের হল না কেন। সন্দেহ নিরসনের জন্যে সে পিছন ফিরে তাকাল - কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। রাহান নিঃশব্দে উঠে এসে তাকে পিছন থেকে আঘাত করেছে - এক টুকরো পাথর অত্যন্ত আদিম অস্ত্র, কিন্তু এখনো সেটি চমৎকার কাজ করে।

রাহান হাজীবের অচেতন দেহের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, “আমাকে তুমি যত আহাম্মক ভেবেছিলে আমি তত আহাম্মক নই। আমার গায়ে ক্যাভলারের একটা বুলেটপ্রুফ ভেস্ট লাগানো আছে - তোমার সাথে এমনি দেখা করতে আমার সাহস হয়নি।“

রাহান হাজীবের অচেতন শরীরটি টেনে অন্ধকার-জগতের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। অন্ধকার-জগতের মানুষেরা নূতন অতিথি পেলে কী করে সেটি জানার হাজীবের খুব কৌতুহল ছিল। কিছুক্ষণেই তার জ্ঞান ফিরে আসবে - এই কৌতুহলটি সে মিটিয়ে নেবে তখন।

হাজীবের এই চিড়িয়াখানার কথা কেউ জানে না। তাকে উদ্ধার করতে কেউ আসবে না। নিজের সৃষ্টির সাথে সে তার জীবনের বাকি অংশটুকু কাটিয়ে দেবে।

কে জানে ড. ম্যাঙ্গেলাকে নিয়ে তার ধারনার পরিবর্তন হবে কি না !

বেজি

॥ এক ॥

নিয়াজ ট্রলারের ছাদে বসে দেখল সমুদ্রের গাঢ় সবুজ উপকূলটি প্রথমে হালকা নীল হয়ে ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। যতক্ষণ উপকূলটা দেখা যাচ্ছিল ততক্ষণ মনে হচ্ছিল বুঝি বা তীরের সাথে একটা যোগাযোগ আছে। সেটি যখন অদৃশ্য হয়ে গেল তখন হঠাৎ নিয়াজ অসহায় অনুভব করে। চারিদিকে শুধু পানি আর পানি, তার মাঝে ছোট একটা ট্রলার টুকটুক করে এগিয়ে যাচ্ছে এই ব্যাপারটিকেই তার কেমন জানি অবাস্তব মনে হয় - চিন্তা করলেই নিয়াজের পেটের ভেতরে পাক দিয়ে ওঠে। সে সাঁতার জানে না, পানি নিয়ে সব সময়েই তার ভেতরে একটা ভয়। তার চাপাচাপিতেই ট্রলারে সবার জন্যে লাইফ-জ্যাকেট রাখা হয়েছে কিন্তু হঠাৎ যদি কোনো কারণে ট্রলার ডুবে যায় তাহলে এই লাইফ-জ্যাকেট দিয়ে তারা কী করবে ?

নিয়াজের পাশেই শ্রাবণী দুই হাঁটুতে মুখ রেখে দূরে তাকিয়ে ছিল। তার চোখেমুখে কেমন যেন একধরনের উঁদাসী ভাব। নিয়াজ নিচুগলায় জিজ্ঞেস করল, "তোর ভয় লাগছে না তো ?"

শ্রাবণীর চোখমুখের উদাস ভাবটা কেটে গিয়ে সেখানে একটা তেজি ভাব ফুটে উঠল। গলা উঁচিয়ে বলল, "তোদের ধারণা মেয়ে হলেই তার সব সময় ভয় লাগতে থাকবে ?"

নিয়াজ অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "না, না - তা না। আমার নিজের ভয় লাগছে তো তাই তোকে জিজ্ঞেস করছি। পানি দেখলেই আমার ভয় লাগে।"

শ্রাবণী শব্দ করে হেসে বলল, "কী বলছিস তুই ? পানি দেখলে ভয় লাগে ? পানির মতো এত সুন্দর জিনিস দেখে কেউ ভয় পায় ? দ্যাখ - তাকিয়ে দেখ।"

নিয়াজ তাকিয়ে দেখল, পানির রংটি আশ্চর্যরকম নীল, চারিদিকে যতদূর চোখ যায় সেই নীল পানি এবং এই নীল রংটির মাঝে একটা অপূর্ব সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে। সে মাথা নেড়ে বলল, "তা ঠিক। সমুদ্রের পানির মাঝে কিছু একটা আছে। একটা অন্যরকম ব্যাপার। তীর থেকে একরকম আবার ওপর থেকে অন্যরকম।"

"আর তুই এই সুন্দর পানিকে ভয় পাচ্ছিস ?"

জয়ন্ত পা ছড়িয়ে বসে অনেকক্ষণ থেকে একটা সিগারেট ধরানোর চেষ্টা করছিল, বাতাসের জন্যে সুবিধে করতে পারছিল না, শেষপর্যন্ত সফল হয়ে সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বলল,

“মানুষের শরীরের সিক্সটি পার্সেন্ট হচ্ছে পানি - হিসেব করলে পা থেকে এই বুক পর্যন্ত আসে। সেই পানিকে তুই পছন্দ করিস না ?“

শ্রাবণী আবার শব্দ করে হেসে বলল, “ওভাবে বলিস না তো ! সিক্সটি পার্সেন্ট পানি বললেই মনে হয় শরীরের নীচের অংশটা পানিতে থলথল করছে !“

জয়ন্ত নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের করে হা হা করে হেসে বলল, “আর সুঁই দিয়ে ছোট একটা ফুটো করলেই সব পানি লিক করে বের হয়ে ফাটা বেলুনের মতো চুপসে যাচ্ছে !“

নিয়াজ মুখ কুঁচকে জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে বলল, “তুই এর মাঝে একটা সিগরেট ধরিয়ে ফেললি - এই সুন্দর পরিবেশটাকে পলিউট করে দিলি ? বাতাসটাকে বিষাক্ত করে দিলি ?“

জয়ন্ত সিগারেটে আরেকটা লম্বা টান দিয়ে বলল, “দ্যাখ নিয়াজ তোকে আমি লোকাল গার্জিয়ান বানাইনি যে বসে বসে আমার ওপর মাতবরি করবি। আর বাতাসের পলিউশানের কথা যদি বলিস তাহলে ঐ তাকিয়ে দেখ তোর এই ট্রলারের শ্যালো ইঞ্জিন থেকে কী পরিমাণ কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে।“

“তাই বলে এই একবিংশ শতাব্দির মানুষ হয়ে তুই সিগারেট খাবি ? আমি বুঝতেই পারি না মেডিক্যালের একজন স্টুডেন্ট হয়ে সে কেমন করে সিগারেট খেতে পারে।“

“এটাকে বলে নেশা। সিগারেটে নিকোটিন বলে একটা বস্তু থাকে। সেটা রক্তের মাঝে মিশে গিয়ে স্নায়ুতে এক ধরনের আরাম দেয়। মেডিক্যালের একজন স্টুডেন্ট কেমন করে এই সহজ জিনিসটা জানে না আমি সেটাও বুঝতে পারি না।“

শ্রাবণী একটা ছোট ধমক দিয়ে বলল, “তোরা থামবি ? দুই সতিনের মতো ঝগড়া শুরু করে দিলি দেখি !“

সিগারেট খাওয়া এবং না খাওয়ার তর্ক এত সহজে থামার কথা ছিল না কিন্তু ঠিক তখন তারা দেখতে পেল ট্রলারের পাশ দিয়ে বিশাল একটি সামুদ্রিক কচ্ছপ ভেসে যাচ্ছে। তিনজনই খানিকটা উত্তেজিত হয়ে এই বিশাল কচ্ছপটার দিকে তাকিয়ে রইল। শ্রাবণী বলল, “ইশ, সাথে ক্যামেরাটা থাকলে একটা ছবি নেয়া যেত !“

নিয়াজ বলল, “নিয়ে এলি না কেন ?“

“ভাবলাম - যাচ্ছি রিলিফ ওয়ার্ক করতে - পিকনিক করতে তো আর যাচ্ছি না। পিকনিকে গেলেই না ক্যামেরা ক্যাসেট প্লেয়ার এসব নিয়ে যায় !“

নিয়াজ বলল, “এটা তো আর লোক-দেখানো ব্যাপার না যে সাথে ক্যামেরা নিতে পারব না! আসল কথা হচ্ছে সিনসিয়ারিটি। আন্তরিকতা।“

জয়ন্ত সমুদ্রটাকে তার সিগারেটের এ্যাশট্রে হিসেবে ব্যবহার করে একটু ছাই ফেলে বলল, “রিলিফ ওয়ার্কে গিয়ে যখন দেখবি মানুষ দুদিন ধরে না খেয়ে আছে, গায়ে কাপড় নেই তখন এমনিতেই ক্যামেরা আর ক্যাসেটপ্লেয়ারের কথা ভুলে যাবি।“

ট্রলারের ছাদে তিনজন চুপ করে বসে রইল। গত সপ্তাহে এরকম সময়েই ভয়ঙ্কর একটা সাইক্লোন এই এলাকায় সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছে। টেলিভিশনে সেই ছবি দেখে কারো বিশ্বাস হতে চায় না বাতাসের মতো নিরীহ একটি জিনিস এরকম প্রলয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতে পারে। জয়ন্ত অন্যমনস্কভাবে তার সিগারেটে দুটো টান দিয়ে দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল, “বাই দা ওয়ে - তোদের দুজনকে থ্যাংকস। ছুটির মাঝে ফুর্তিফার্তা না করে আমার কথায় রিলিফ নিয়ে চলে এলি। একা একা এসব কাজে খুব বোরিং লাগে। আর বদমাইশ সাইক্লোনটা দেখ, হিট করার জন্যে কী একটা সময় বেছে নিল।“

শ্রবণী বলল, “তুই কী ভেবেছিলি সাইক্লোন পঞ্জিকা দেখে দিনক্ষণ ঠিক করে আসবে ?“

“না তা অবশ্যি ভাবিনি।“ জয়ন্ত শ্রাবণীর দিকে তাকিয়ে বলল, “আর শ্রাবণী তোকে স্পেশাল থ্যাংকস। পুরুষমানুষকে রাজি করাতে পারি না, আর তুই মেয়ে হয়ে রিলিফ নিয়ে চলে এলি !“

“তোদের নিয়ে তো মহামুশকিল হল !“ শ্রাবণী অধৈর্য হয়ে বলল, “মেয়ে আর ছেলে এই জিনিসটা মনে হয় এক সেকেণ্ডের জন্যেও তোরা ভুলতে পারিস না।“

“কে বলে ভুলতে পারি না ?“ জয়ন্ত ষড়যন্ত্রীর মতো মুখ করে বলল, “আমরা তো ভুলতেই চাই। তোরাই তো ভুলতে দিস না।“

“কখন আমরা তোকে ভুলতে দেই না ?“

“ঐ যে লজ্জাবনত কটাক্ষ, ব্রীড়াময়ী ভঙ্গি, লাস্যময়ী হাসি !“

“কী বললি ? কী বললি তুই ? আমি ব্রীড়াময়ী ভঙ্গি আর লাস্যময়ী হাসি দিই ? ধাক্কা দিয়ে যখন পানিতে ফেলে দেব তখন লাস্যময়ী হাসি আর ব্রীড়াময়ী ভঙ্গির মজাটা টের পাবি। কচ্ছপ কপ করে কাঁচা খেয়ে ফেলবে।“

“ফর ইওর ইনফরমেশান ইওর হাইনেস শ্রাবণী - কচ্ছপ কখনো কাউকে কপ করে খেয়ে ফেলে না।“

“তোকে বলেছে !“

নিয়াজ শ্রাবণী আর জয়ন্তর হালকা কথাবার্তায় মন দিতে পারছিল না। যতক্ষণ পর্যন্ত গন্তব্যে না-পৌঁছাচ্ছে সে ঠিক স্বস্তি পাচ্ছে না। সমুদ্রের ভয়ঙ্কর ঢেউয়ে ছোট ট্রলার উথালপাথাল হয়ে দুলবে এরকম একটা ভয় ছিল কিন্তু সেরকম কিছু হয়নি, সমুদ্রটি একটা বড় দিঘির মতো শান্ত, কিন্তু তবুও সে বিশ্বাস করতে পারছে না। মনে হচ্ছে হঠাৎ করে কিছু-একটা ঘটে যাবে। সামনে দূরে কোন-একটা দ্বীপ খুঁজতে খুঁজতে সে শুকনো গলায় বলল, “আর কতক্ষণ যেতে হবে রে ?“

জয়ন্ত চোখ কপালে তুলে বলল, “কতক্ষণ যেতে হবে মানে ? মাত্র তো শুরু করলাম। এখনো কমপক্ষে চার ঘণ্টা।“

“চার ঘণ্টা !“

“হ্যাঁ। কেন ? তোর ভয় লাগছে ?“

নিয়াজ দুর্বলভাবে হাসল, বলল, “না ঠিক ভয় না। নার্ভাস।“

“ধূর ! নার্ভাস লাগার কি আছে ? নিচে গিয়ে শুয়ে থাক।“

“শোওয়ার জায়গা কই ? টয়লেট পেপার দিয়ে ট্রলার বোঝাই করে রেখেছিস।“

“টয়লেট পেপার ?“ জয়ন্ত হা হা করে হেসে বলল, “টয়লেট পেপার তুই কোথায় দেখলি ? ওগুলো হচ্ছে মেডিক্যাল সাপ্লাই।“

“আমাদের দেশের মানুষের ওরকম মেডিক্যাল সাপ্লাই কোনো কাজে লাগে না। তাদের দেশে যেগুলো কোন কাজে আসে না সেগুলো এখানে রিলিফ নাম দিয়ে পাঠিয়ে দেয়।“

“সেটা ঠিকই বলেছিস।“ জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলল, “একবার বন্যার পর রিলিফ নিয়ে গেছি, ব্রিটিশ একটা অর্গানাইজেশন রিলিফ পাঠিয়েছে, বাক্স খুলে দেখি ভিতরে সান ট্যানিং লোশান ! মানুষকে বোঝাতেও পারি না জিনিসটা কী কাজে লাগে।“

জয়ন্তের কথা শুনে শ্রাবণী আর নিয়াজ দুজনই খানিকক্ষণ হাসল এবং তারপর খানিকক্ষণ পশ্চিমা দেশের মুণ্ডুপাত করল। জয়ন্ত তার সিগারেটের শেষ অংশটুকুতে একটা লম্বা টান দিয়ে তার গোড়াটা সমুদ্রে ফেলে দিয়ে ট্রলারের ছাদে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। শ্রাবণী হাঁটুতে মুখ রেখে

উদাস হয়ে বসে থাকে এবং নিয়াজ কিছু একটা করে সময় কাটানোর জন্যে নীচে নেমে এল। তার ব্যাগে কিছু বই এবং কাগজপত্র আছে। সেগুলো দেখে সময় কাটাতে যায়।

মানবসভ্যতার বিকাশের উপর গভীর জ্ঞানের একটা বই পড়ার চেষ্টা করে নিয়াজ বেশি সুবিধা করতে পারল না - তখন সে একটা রগরগে ডিটেকটিভ বই নিয়ে বসল। ওষুধের একটা বড় বাক্সের উপর পা তুলে দিয়ে ট্রলারের বেঞ্চে আধাশোয়া হয়ে সে দীর্ঘ সময় নিয়ে বইটা পড়ে প্রায় শেষ করে বাইরে তাকায়। চারিদিকে এখনো সেই পানি। সবকিছুর যেরকম একটা সীমা থাকে, পানির বেলাতেও সেটা মনে হয় সত্যি, এত সুন্দর নীল দেখেও সে কেমন জানি হাঁপিয়ে উঠছে। নিয়াজ বইটা বগলে নিয়ে আবার ট্রলারের ছাদে উঠে এল। সেখানে জয়ন্ত লম্বা হয়ে শুয়ে সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে, হঠাৎ করে গড়িয়ে পানিতে পড়ে না যায় ভেবে নিয়াজ রীতিমতো আঁতকে উঠে। শ্রাবণী সেই একইভাবে পা দুলিয়ে উদাস-মুখ করে বসে আছে, নিয়াজকে দেখে জিজ্ঞেস করল, “খিদে পেয়েছে ?“

নিয়াজের খাওয়ার কথা মনেই ছিল না, কিন্তু শ্রাবণীর কথা শুনেই চট করে খিদে পেয়ে গেল, মাথা নেড়ে বলল, “কিছু তো পেয়েছেই।“

“নিচে দ্যাখ আমার ব্যাগটা আছে। নিয়ে আয়। কয়টা স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে এনেছি।“

নিয়াজ শ্রাবণীর ব্যাগটা নিয়ে এল। ভেতরে প্লাস্টিকের বাক্সে স্যাণ্ডউইচ, কয়টা লাড্ডু, কলা এবং কয়েকটা কোল্ড ড্রিংকস। দেখে নিয়াজের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল, “বাহ ! এই দ্যাখ - তুই যে সবসময় বলিস ছেলে আর মেয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নাই সেটা সত্যি নয়। তুই কি মনে করিস কখনে আমি কিংবা জয়ন্ত এখাবে গুছিয়ে খাবার আনতে পারতাম ?

জয়ন্ত নিজের নাম শুনে চোখ খুলে বলল, “কী হয়েছে ?“

শ্রবণী হেসে বলল, “দেখলি খাবারের গন্ধে কীরকম জেগে উঠেছে ?“

“খাবার ?“ জয়ন্ত এবারে সত্যি সত্যি উঠে বসল, “খাবারের কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম! কে এনেছে খাবার ?“

“শ্রাবণী !“

জয়ন্ত হাতে কিল মেরে বলল, “ফ্যান্টাস্টিক ! যা ক্ষিদে পেয়েছে কী বলব। বঙ্গোপসাগরের এই রুচিকর হাওয়ায় মনে হচ্ছে একটা আস্ত ঘোড়া খেয়ে ফেলতে পারব।“

শ্রাবণী স্যান্ডউইচ বের করতে করতে বলল, “সরি জয়ন্ত, তোর জন্যে আমি ঘোড়া রান্না করে আনিনি। স্যান্ডউইচ খেতে হবে।“

“বিপদে পড়লে বাঘে ঘাস খায় - আর এটা তো স্যান্ডউইচ।“

শ্রাবণী কিছু খাবার আলাদা করে নিয়াজের হাতে দিয়ে বলল, “এটা মাঝিকে দিয়ে আয়।“

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলল, “জব্বার মিয়া তোর এই আধুনিক খাবার খেতে পারবে না। শুঁটকি দিয়ে ভাত যদি থাকে দে।“

“বাজে বকিস না।“

নিয়াজ হাতে করে স্যান্ডউইচ আর কলা নিয়ে ট্রলারের ছাদে হামাগুড়ি দিয়ে পিছনে এগিয়ে গিয়ে ডাকল, “জব্বার মিয়া।“

জব্বার মিয়া মধ্যবয়সী মানুষ। দেখে মনে হয় জগতের কোনোকিছুতেই সে কখনো বিস্মিত হয় না। চোখেমুখে এক ধরনের শান্ত এবং পরিতৃপ্ত ভাব। নিয়াজের দিকে তাকিয়ে বলল, “জে।“ শ্যালো ইঞ্জিনের প্রবল শব্দের জন্যে তাকে প্রায়ই চিৎকার করে কথা বলতে হয়।

“নেন। স্যাণ্ডউইচ খান।“

জব্বার মিয়া মুখে মনোরম একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, “আপনারা খান।“

“আমরা তো খাচ্ছি। আপনিও খান।“

“জায়গামত পৌঁছে খাব। এখন থাক।“

নিয়াজ ঠিক বুঝতে পারল না যে মানুষটা খেতে চাইছে না তাকে পীড়াপীড়ি করা উচিত হবে কি না। সে ফিরে আসার জন্যে মাথা ঘুরিয়েই দেখতে পায় বহুদূরে হালকা ছায়ার মতো একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। সে জব্বার মিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, “আমরা কি ঐখানে যাচ্ছি ?“

“জে না।“

“তাহলে কোথায় যাচ্ছি ?“

“আরো দূরে।“

“আর কতক্ষণ ?“

জব্বার মিয়া সূর্যের দিকে তাকিয়ে সময় কেমন জানি অনিশ্চিতের মতো বলল, “এই তো আর কিছুক্ষণ।“

কথাটার কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ নেই, তাছাড়া সময়ের অনুমান করার জন্যে যার সূর্যের দিকে তাকাতে হয় তার কাছে সময় সম্পর্কে সুক্ষ্ম কোনো সদুত্তর পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। নিয়াজ হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে এসে বলল, “জব্বার মিয়া তোর সাহেবি খাবার খাবে না।“

শ্রাবণী বিরক্ত হয়ে বলল, “বাজে কথা বলিস না। না-খেলে না-খাবে - তুই দিয়ে আয়।“

নিয়াজ ইতস্তত করে বলল, “ইয়ে খেতে চাইছে না -তাকে জোর করে -“

শ্রাবণী নিয়াজের হাত থেকে খাবারগুলো নিয়ে বলল, “পুরুষমানুষের জিনেটিক কোডিংয়ে কিছু গোলমাল আছে, কমনসেন্স কম। একজনকে খাবার দিলে সে না খায় কেমন করে ?“

শ্রাবণী ট্রলারের উপর দিয়ে হেঁটে পিছনে গিয়ে জব্বার মিয়ার হাতে খাবার ধরিয়ে দিয়ে ফিরে এল, জব্বার মিয়াকে আপত্তি করার কোনো সুযোগ পর্যন্ত দিল না। নিয়াজ একধরনের বিস্ময় নিয়ে শ্রাবণীর দিকে তাকিয়ে থাকে - মেয়েটির মাঝে একধরনের স্বতঃস্ফূর্ততা আছে যেটা সে হাজার চেষ্টা করেও আয়ত্ত করতে পারবে না।

শ্রাবণী দূরে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, “দ্যাখ কি সুন্দর একটা দ্বীপ !“

“দেখেছি।“

“কী নাম এটার ?“ শ্রাবণী জব্বার মিয়াকে জিজ্ঞেস করল, “জব্বার ভাই এইটা কোন দ্বীপ ?“

“হকুনদিয়া।“

“হকুনদিয়া ? কী পিকুলিয়ার নাম।“

“জে। আগে এটার নাম ছিল দিঘলদিয়া। এখন হকুনদিয়া। উপরে হকুন উড়ে তাই নাম হকুনদিয়া !“

শ্রাবণী একটা গল্পের খোঁজ পেয়ে জব্বার মিয়ার দিকে এগিয়ে গেল, “শকুন উড়ে ?“

“জে। হকুন উড়ে।“

“কেন ?“

“কোনো মানুষ যেতে পারে না। যেই যায় সেই মরে। মরার খোঁজে হকুন উড়ে।“

শ্রাবণী চোখ বড় বড় করে জব্বার মিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল, “যেই যায় সেই মরে ?“

“জে। পাঁচ-ছয় বছর আগে পাগলা ডাক্তার খুন হওয়ার পর আর কেউ যেতে পারে না।“

“পাগলা ডাক্তার ?“

“জে।“

“এখানে একজন পাগলা ডাক্তার থাকতেন ?“

জব্বার মিয়া দাঁত বের করে হেসে বলল, “আসলে পাগল ছিলেন না। এলাকার লোক মায়া করে ডাকত পাগলা ডাক্তার। বিজ্ঞান মতে গবেষণা করতেন। অনেক আলেমদার মানুষ ছিলেন।“

“খুন হলেন কেমন করে ?“

জব্বার মিয়া এই পর্যায়ে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে দার্শনিকের মতো বলল, “এইটা দুনিয়ার নিয়ম। যতো ভালো মানুষ সব খুন হয়ে যায়। বদ মানুষেরা বেঁচে থাকে।“

এতক্ষণে দ্বীপটি আরো কাছে চলে এসেছে, সবুজ গাছে ঢাকা। বড় বড় নারকেল গাছ উপকূলটিকে ঢেকে রেখেছে। এত সুন্দর একটা দ্বীপ সম্পর্কে কীরকম অশুভ একটি প্রচার। পাগলা ডাক্তার ভদ্রলোকটির জন্যে শ্রাবণী একধরনের সমবেদনা অনুভব করে। মানুষটি নিশ্চয়ই অন্যরকম ছিলেন, তা না হলে সবকিছু ছেড়েছুড়ে এরকম নির্জন দ্বীপে কেউ জীবন কাটাতে আসে ?

শ্রাবণী নিয়াজ আর জয়ন্তর কাছে ফিরে এসে বলল, “এই দ্বীপটা দেখেছিস, কী সুন্দর !“

নিয়াজ গোগ্রাসে স্যান্ডউইচ খেতে খেতে বলল, “হু।“

“এখানে কোনো মানুষ থাকতে পারে না, গেলেই মারা পড়ে।“

“সত্যি ?“

“জব্বার ভাই তো তাই বলল।“

“আর তুই বিশ্বাস করে বসে আছিস ?“

“কেন বিশ্বাস করব না ? দ্বীপের নাম পর্যন্ত পাল্টে ফেলেছে - আগে ছিল দিঘলদিয়া, এখন হয়ে গেছে হকুনদিয়া। হকুন মানে বুঝলি তো ? শকুন।“

জয়ন্ত এক কামড়ে কলার একটা বড় অংশ মুখে পুরে খেতে খেতে বলল, “মানুষ গেলে কেন মারা পড়ে সেটা বলেছে ?“

“না। একজন পাগলা ডাক্তার থাকতেন - সেই পাগলা ডাক্তার খুন হয়ে যাবার পর থেকে এই অবস্থা।“

"ভেরি ইন্টারেস্টিং !" জয়ন্ত দ্বীপটির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "দেখে বোঝার উপায় নেই যে এটা হন্টেড। এতদিন শুধু হন্টেড হাউজ শুনে এসেছি, এখন দেখা যাচ্ছে হন্টেড আইলেন্ড ! আস্ত একটা দ্বীপ হন্টেড। পাগলা ডাক্তারের প্রেতাত্মা কন্ট্রোল করছে !"

শ্রাবণী বলল, "সবকিছু নিয়ে ঠাট্টা করবি না।"

"কে বলেছে আমি ঠাট্টা করছি ?" জয়ন্ত বিশেষ মনোযোগ দিয়ে খেতে খেতে বলল, "আমি বলি কী, ফেরত যাওয়ার আগে এই হকুনদিয়া দ্বীপটা ইনভেস্টিগেট করে যাই।"

"কেন ?"

"আমি কখনো হন্টেড প্লেস দেখি নাই। এটা হচ্ছে সুযোগ। সত্যিকথা বলতে কী, পাগলা ডাক্তারের প্রেতাত্মাকে যদি একটা শিশির ভেতরে ভরে নিয়ে যেতে পারি -"

শ্রাবণী বিরক্ত হয়ে বলল, "বাজে কথা বলবি না।"

ট্রলারটি হকুনদিয়া দ্বীপের খুব কাছ দিয়ে যাবার সময় তিনজনই খুব কৌতূহল নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল। তাদের কেউই জানত না আগামী আটচল্লিশ ঘন্টার মাঝেই এই দ্বীপটিকে নিয়ে তাদের জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটতে যাচ্ছে।

॥ দুই ॥

ট্রলারটি যখন গন্তব্যে পৌঁছেছে তখন বেলা গড়িয়ে এসেছে। নিয়াজ, জয়ন্ত আর শ্রাবণী বড় একটি রিলিফ-কাজের ছোট একটা অংশ হিসেবে এসেছে - কাজেই তাদের কোনো গুরুত্ব দেবে কি না সেটা নিয়ে খুব সন্দেহের মাঝে ছিল - কিন্তু দেখা গেল তাদের আশঙ্কা অমূলক। বিশাল একটি বার্জ সমুদ্রের মাঝে নোঙর করে রাখা আছে। সেটি ঘিরে নানারকম কর্মব্যস্ততা। অসংখ্য ট্রলার এবং নৌকা, কিছু ছোট লঞ্চ, বেশকিছু স্পিডবোট দাঁড়িয়ে আছে, তার মাঝে নানারকম রিলিফ-সামগ্রী তোলা হচ্ছে - লোকজনের হৈচৈ চেঁচামেচিতে একটা কর্মমুখর পরিবেশ। কিন্তু তার ভেতরেই তিনজন পৌঁছানো মাত্রই তাদেরকে রিলিফ কাজের দায়িত্বে যে-মানুষটি তার কাছে নিয়ে যাওয়া হল। ভদ্রলোক জাতীতে ব্রিটিশ, মধ্যবয়স্ক, চুলদাড়িতে পাক ধরেছে। রোদে পোড়া চেহারা। তাদেরকে দেখে ভারি খুশি হলেন। জরুরিভাবে যোগাযোগ করে এই জিনিসগুলো আনা হয়েছে - বোঝা গেল ওগুলো ছাড়া রিলিফ ওয়ার্কের ওষুধপত্রে একধরনের অসংগতি থেকে যেত। ব্রিটিশ ভদ্রলোক ইংরেজিতে বললেন, “তোমরা অনেক কষ্ট করে এসেছ, এখন বিশ্রাম নাও। বার্জের ওপরে তোমাদের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে।“

জয়ন্ত ইংরেজি মোটামুটি গুছিয়ে লিখতে পারে কিন্তু বলার সময় তার খানিকটা বাধো-বাধো ঠেকে। তাই দিয়েই সে বলল যে তারা ট্রলারে শুয়ে-বসে এসেছে এবং মোটেও ক্লান্ত নয়। এই কথা শুনে সাথে সাথে তাদের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হল, শারিরীক পরিশ্রম করার মতো অনেক মানুষ আছে, কিন্তু মোটামুটি লেখাপড়া জানে এখানে এরকম মানুষের খুব অভাব।

বার্জ থেকে নানা রিলিফ বের করে ট্রলার এবং নৌকায় তোলা হতে লাগল। ম্যাপে ছোট ছোট দ্বীপগুলো চিহ্নিত আছে। কোথায়, কত মানুষ মারা গেছে, কতজন ঘরবাড়ি হারিয়েছে, কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে লিখে রাখা আছে। ম্যাপ এবং লিস্ট দেখে জিনিসপত্রের পরিমাণ ঠিক করে চিরকুটে সংখ্যাটি লিখে দেওয়া হতে লাগল। সেটি দেখে মালপত্র বোঝাই করে ট্রলার-নৌকা-লঞ্চগুলো চলে যেতে শুরু করল। যেগুলো গিয়েছে সেগুলো ফিরে আসতে শুরু করেছে। সেখানে মালপত্র বোঝাই করে আবার তাদের নতুন জায়গায় পাঠানো হতে লাগল।

রিলিফ ওয়ার্কে আরো অনেকে এসছে। একটা বড় অংশ এসেছে কিছু এনজিও থেকে। বিশ্ববিদ্যালয় আর কলেজের আরো কিছু ছাত্র এসেছে। ছাত্রী হিসেবে শ্রাবণীই একজন তবে

ব্রিটিশ রিলিফ টিমের সাথে কয়েকজন মহিলা এসেছে। জয়ন্ত যদিও মুখ টিপে হেসে বলল, “তারা শুধু নামেই মহিলা, দেখতে শুনতে আকারে এবং আকৃতিতে সবাই এই দেশের বড় সন্ত্রাসীর মতো !“

সমস্ত কাজ শেষ করে ঘুমুতে ঘুমুতে গভীর রাত হয়ে গেল। বার্জের ডেকে সবার শোওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, শুধু মেয়েদের আলাদা কেবিন দেয়া হয়েছে। শ্রাবণীর কেবিনটি দেখে জয়ন্ত এবং নিয়াজের চোখ হিংসায় ছোট ছোট হয়ে গেল। ছোট বাংক বেড, মাথার কাছে গোল জানালা, ছোট খেলনার মতো একটা সিংক, লাগোয়া বাথরুম, সবকিছু ঝকঝক তকতক করছে। জয়ন্ত দেখেশুনে মুখ ছুঁচালো করে বলল, “তোরা না নারীবাদী মহিলা - আমাদেরকে শুকনো ডেকের মাঝে শুইয়ে রেখে নিজে এরকম কেবিন নিয়ে ঘুমুচ্ছিস যে ?“

“আমি নিইনি। আমাকে দেয়া হয়েছে।“

“ছুড়ে ফেলে দে। বলে দে থাকব না এখানে।“

শ্রাবণী বক্তৃতা দেয়ার ভঙ্গি করে বলল, “যে জাতি নারীদের সম্মান করে না সেই জাতির উন্নতি হয় না। তোরাও শেখ।“

পরের দিনটিও ব্যস্ততার মাঝে কাটল। বিকেলের দিকে তারা একটা দলের সাথে কাছাকাছি ছোট একটা দ্বীপে রিলিফ নিয়ে গেল। তাদেরকে আসতে দেখে অনেক আগে থেকে মানুষজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শুকনো অভুক্ত মানুষ - ঘরবাড়ি ভয়ঙ্কর সাইক্লোন আর জলোচ্ছাসে উড়ে গেছে। আগে থেকে খবর পেয়েছিল বলে নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে অবশ্য বেশির ভাগ মানুষ প্রাণে বেঁচে গিয়েছে।

ফিরে আসার সময় আবার তারা হকুনদিয়া দ্বীপের অন্য পাশ দিয়ে ফিরে এল। গভীর অরণ্যে ঢেকে থাকা দ্বীপটি দূর থেকে খুব রহস্যময় মনে হয়। এখানে কোনো মানুষ নেই। কেউ গেলে সাথে সাথে মারা পড়ে চিন্তা করলেই কেমন জানি ভয় হয়।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে জয়ন্ত আবিষ্কার করল, আজকের দিনটিতে তাদের ছুটি দেওয়া হয়েছে। ঢাকা থেকে বেশকিছু ভলান্টিয়ার এসছে, তাদেরকে ব্যস্ত রাখার জন্যে সব কাজকর্মই তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেখানে বার্জটি নোঙর করে রাখা হয়েছে সেই দ্বীপটি ঘুরে

দেখা যেতে পারে, কিন্তু এটি একেবারেই সাদামাটা একটা দ্বীপ। সাইক্লোনে ঘরবাড়ি ধুয়েমুছে গিয়ে আরো সাদামাটা হয়ে গেছে। গ্রাম্য পথ ধরে হেঁটে আবিষ্কার করল সঙ্গে শ্রাবণী থাকার কারণে পেছনে ছোট ছোট বাচ্চার একটি বড় মিছিল তৈরি হয়ে গেছে। বাচাগুলোর সাথে কথা বলার চেষ্টা করে লাভ হল না। শহরের এই মানুষগুলোকে তারা বুঝতে পারে না। কথাবার্তা বললে তারা দৌড়ে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে। এরকম সময়ে জয়ন্ত বলল, "চল, হকুনদিয়া দ্বীপ থেকে ঘুরে আসি।"

নিয়াজ ভুরু কুঁচকে বলল, "কী বললি ?"

"বলেছি হকুনদিয়া দ্বীপ থেকে ঘুরে আসি।"

"কীভাবে যাবি ?"

"খোঁজ করলেই একটা স্পিডবোট ট্রলার কিছু একটা পেয়ে যাব।"

শ্রাবণী বলল, "তারপর যখন খুন হয়ে যাবি তখন কী হবে ?"

জযন্ত বলল, "তুই সত্যিই বিশ্বাস করিস ওখানে গেলেই মানুষ খুন হয়ে যায় ?"

"সবাই যখন বলছে তখন নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে।"

জয়ন্ত একটু রেগে বলল, "এখানকার মানুষেরা আরো কী বলছে শুনিস নি ?"

"কী বলছে ?"

"বলেছে সাইক্লোনটা সোজা এদিকে আসছিল, এখানকার এক পীর সাহেব ধমক দিয়ে পুবদিকে সরিয়ে নিয়েছেন। বলছে গভীর রাতে গ্রামের রাস্তায় বাস্তায় ওলাবিলা ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে - যার অর্থ গ্রামের সব মানুষ কলেরায় মরে যাবে। বলছে চাঁদনী রাতে সুপারি গাছে বসে বসে পরীরা আকাশে উড়ছে। আরও শুনবি ?"

"থাক, অনেক বক্তৃতা হয়েছে।"

জয়ন্ত গলা উচিয়ে বলল, "তোরা যেতে না চাইলে নাই। দরকার হলে আমি একা যাব।"

"কেন ?"

"প্রমাণ করতে চাই পুরোটা কুসংস্কার। আর কিছু না হোক তখন মানুষ আবার এই সুন্দর দ্বীপটায় থাকতে পারবে।"

শ্রাবণী কিছু না বলে জয়ন্তর চোখে তাকিয়ে রইল। জয়ন্ত বলল, "মনে করিস না আমি পাগলামো করছি। এরকম একটা ব্যাপার জেনেশুনেও যদি দ্বীপটাতে অন্তত পা না ফেলে আসি তাহলে নিজের কাছে নিজের খারাপ লাগবে, মনে হবে কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিয়ে ফেললাম।"

"ঠিক আছে।" শ্রাবণী মাথা নেড়ে বলল, "আমি যাব।"

নিয়াজ বলল, "তাহলে আমি একা আর বসে থেকে কী করব ? আমিও যাব।"

জয়ন্ত হাতে কিল দিয়ে বলল, "চমৎকার ! আমি গিয়ে দেখি একটা স্পিডবোট ট্রলার নৌকা কিছু-একটা পাই কি না।"

শ্রাবণী মনে মনে আশা করছিল রিলিফ-কাজে সবাই ব্যস্ত থাকবে, জয়ন্তের এরকম পাগলামোর জন্য কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু দেখা গেল কিছুক্ষণের মাঝেই জয়ন্ত একগাল হাসি নিয়ে ফিরে এল, সে জব্বার মিয়াকেই পেয়ে গেছে। জব্বার মিয়া চাইছে না তারা সেখানে যাক, কিন্তু যখন জোরাজুরি করেছে তখন শেষপর্যন্ত পৌঁছে দিতে রাজি হয়েছে।

কিছুক্ষণের মঝেই দেখা গেল, সমুদ্রের নীলপানি কেটে জব্বার মিয়ার ট্রলারটা ছুটে যাচ্ছে। ট্রলারের ছাদের ওপর তিনজন চুপচাপ বসে আছে।

হকুনদিয়া দ্বীপে পৌঁছে ট্রলারটাকে টেনে খানিকটা বালুর ওপর তুলে জব্বার মিয়া নেমে এল, সে এমনিতেই কথা বেশি বলে না। এখন আরও কম কথা বলছে। জয়ন্ত বলল, "থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জব্বার মিয়া। আপনি নামিয়ে না দিলে আমাদের এখানে আসা হত না।"

"কাজটা ভালো হল না।" জব্বার মিয়া নিচু গলায় বলল, "এর আগেরবার যে খুন হয়েছে, আপনাদের মতোই একজন ছিল। কিছু-একটা সাহস দেখানোর জন্যে এসেছিল, এসে খুন হল।"

জয়ন্ত একটু ফ্যাকাশে মুখে বলল, "আমরা খুন হব না। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না।"

"এখানে আসতে চেয়েছিলেন, এসেছেন।" জব্বার মিয়া শক্তমুখে বলল, "আমি এখানে অপেক্ষা করি, আপনারা একটু ঘুরাঘুরি করে আসেন, ফেরত নিয়ে যাই।"

নিয়াজ মাথা নেড়ে বলল, “হ্যাঁ, জব্বার ভাই ঠিকই বলেছে। তুই আসতে চেয়েছিলি, এসেছিস। এখন চল যাই।“

জয়ন্ত বলল, “তোরা যেতে চাইলে যা। আমি না-দেখে যাব না।“

“এখানে দেখার কি আছে ? জঙ্গল গাছপালা দেখিসনি কখনো ?“

জয়ন্ত বলল, “আমি ভেতরে ঢুকে দেখতে চাই।“

জব্বার মিয়া একটা নিশ্বাস ফেলে ট্রলারের পাটাতন থেকে একটা কাঠ সরাল। দেখা গেল সেখানে হাতে-তৈরি একটা বন্দুক। বন্দুকটা হাতে নিয়ে বলল, “তাহলে এইটা সাথে রাখেন।“

জয়ন্ত ভুরু কুঁচকে বলল, “বেআইনি অস্ত্র ? লাইসেন্স আছে ?“

“লাইসেন্স কোথায় থাকবে ! হাতে-তৈরি বন্দুক ট্রলারে রাখি। চোর-ডাকাতের উৎপাতের জন্য রাখতে হয়।“

“না।“ জয়ন্ত মাথা নাড়ল, “বেআইনি অস্ত্র রাখব না।“

জব্বার মিয়া খানিকক্ষণ জয়ন্তর চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে বন্দুকটা আবার পাটাতনের ভেতরে রেখে কাঠ দিয়ে ঢেকে দিল। জয়ন্ত বলল, “আপনি কোনো চিন্তা করবেন না জব্বার মিয়া। আমাদের কিছু হবে না। আমরা বেশি ভিতরে যাব না - একটু ঘুরোঘুরি করে চলে আসব।“

“আমায় গিয়ে রিলিফ নিয়ে যেতে হবে। রিলিফ পৌঁছে দিয়েই আমি চলে আসব। আপনারা ঠিক এইখানে থাকবেন।“

“ঠিক আছে।“

জব্বার মিয়া এবার ট্রলারের ছাদের সাথে লাগানো একটা লম্বা কিরিচ টেনে বের করে ওদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, “এইটা সাথে রাখেন। এইটা রাখার জন্যে লাইসেন্স লাগে না।“

জয়ন্ত ইতস্তত করে কিরিচটা হাতে নিল, সাবধানে ধার পরীক্ষা করে বলল, “এইটা রাখব?“

নিয়াজ বলল, “রেখে দে। কখন কী কাজে লাগে।“

“যদি কোন বিপদ দেখেন আগুন জ্বালাবেন।“

“আগুন ?“

“হ্যাঁ। ম্যাচ আছে সাথে ?“

"আছে।"

"দুইটা মোমবাতি নিয়ে যান -"

"দিনের বেলা মোমবাতি দিয়ে কী করব ?"

"সাথে রাখেন।" বলে জব্বার মিয়া দুইটা বড় বড় মোমবাতি বের করে দিল।

নিয়াজ মোমবাতিগুলো হাতে নেয়, হঠাৎ করে সে কেমন যেন আতঙ্ক অনুভব করতে থাকে। শুকনো গলায় বলল, "আর কিছু লাগবে জব্বার ভাই ?"

"দড়ি। আর লাঠি।"

"কেন ? দড়ি আর লাঠি কেন ?"

জব্বার মিয়া বলল, "জানি না। তবে মানুষ বিপদে পড়লে লাগে। আগে যে লোকটা খুন হল -"

জব্বার মিয়া হঠাৎ করে থেমে গেল। নিয়াজ ভয়ে ভয়ে বলল, "যে খুন হল ?"

"না, কিছু না।" জব্বার মিয়া মাথা নেড়ে বলল, "আপনারা যখন যাবেনই তখন ভয় দেখিয়ে লাভ কী ?"

"তবু শুনি।"

"শোনার কিছু নাই। একটা গর্তের মাঝে পড়ে ছিল - সাথে দড়ি আর অন্য মানুষ থাকলে বের হতে পারত।"

"ও।"

"হ্যাঁ। সবসময় তিনজন একসাথে থাকবেন।"

"ঠিক আছে।"

"আমি অন্ধকার হবার আগেই আসব।"

"ঠিক আছে।"

জব্বার ট্রলার থেকে একটা লম্বা বাঁশ এবং নাইলনের কিছু দড়ি বের করে দিল। বাঁশটা কেটে তিন টুকরা করে তিনজনের হাতে দিয়ে বলল, "আল্লার মেহেরবান।"

নিয়াজ ফিসফিস করে বলল, "আল্লাহ মেহেরবান।"

"আর শোনেন -" জব্বার মিয়া নিচুগলায় বলল, "চোখগুলি সাবধান।"

"চোখ ?"

"হ্যাঁ। চশমা থাকলে সবসময় চশমা পরে থাকবেন।"

জয়ন্ত অবাক হয়ে বলল, "কেন ?"

জব্বার মিয়া কোন কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

জব্বারের ট্রলারটা শব্দ করে সমুদ্রের বুকে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর ওরা তিনজন একজন আরেকজনের দিকে তাকায়। জয়ন্ত দুর্বল গলায় বলল, "কাজটা ঠিক করলাম কি না বুঝতে পারলাম না।"

শ্রাবণী বলল, "ঠিক করিসনি। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই।"

জয়ন্ত দ্বীপটার দিকে তাকাল। গাছপালা-ঢাকা নিঝুম একটা দ্বীপ। সমুদ্রের ঢেউ এসে তীরে আছড়ে পড়ছে, এছাড়া কোথাও কোনো শব্দ নেই। জয়ন্ত হাতের কিরিচটার ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে বলল, "ভেতরে আর নাইবা গেলাম। বীচটাতে একটু হাঁটাহাঁটি করে দেখি।"

শ্রাবণী মাথা নাড়ল, বলল, "আমাদের জোর করে এখানে এনেছিস - এখন পিছাতে পারবি না।"

"তুই কী করতে চাস ?"

"ভেতরে যাব।"

"ভেতরে যাবি ?"

"হ্যাঁ।"

জয়ন্ত কিছুক্ষণ শ্রাবণীর চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "বেশ।"

তিনজন হেঁটে হেঁটে যখন দ্বীপের ভেতর ঢুকছিল তখন শরৎকালের রৌদ্র মাত্র সতেজ হতে শুরু করেছে।

॥ তিন ॥

যেখানে মানুষের জনবসতি আছে সেখানে পায়ে চলার পথ তৈরি হয়ে যায় - এই দ্বীপটিতে দীর্ঘদিন কোনো মানুষ থাকেনি বলে কোনো পথঘাট নেই। ভেতরে ঢুকতে হলে ঝোপঝাড় ভেঙে ঢুকতে হয়, তিনজন সেভাবেই ঢুকেছে। সবার আগে জয়ন্ত। তার হাতে বড় কিরিচ - ঝোপঝাড় বা বুনোলতা বেশি থাকলে সেটা কেটে পথটা খানিকটা পরিষ্কার করছে। জয়ন্ত থেকে কয়েক হাত পেছনে শ্রাবণী। সবার পিছনে নিয়াজ। পা ফেলার আগে বাঁশের লাঠিটা দিয়ে মাঝে মাঝে পরীক্ষা করছে। ঠিক কী কারণে কারোই সঠিক জানা নেই। বালুবেলায় প্রখর রোদ ছিল, ভেতরে তার কিছু অবশিষ্ট নেই। বড় বড় গাছের ছায়ায় আলো-আঁধারি একধরনের আবছা অন্ধকার।

তিনজন চুপচাপ মিনিট দশেক হাঁটার পর শ্রাবণী হঠাৎ করে নিচুগলায় বলল, “থাম।“

অন্য দুজন সাথে সাথে থেমে যায়। নিয়াজ ভয়-পাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করে, “কী হয়েছে?“

“না, কিছু হয়নি।“

“তাহলে ?“

“আমার শুধু মনে হচ্ছে কেউ আমাদের লক্ষ্য করছে।“

শ্রাবণীর কথা শুনে জয়ন্ত আর নিয়াজ চারিদিকে তাকাল - যতদূর চোখ যায় শুধু গাছ, লতাপাতা ঝোপঝাড়। কেউ যদি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের লক্ষ্য করে সেটি বোঝার কোনো উপায় নেই। ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার জন্য জয়ন্ত হাত নেড়ে বলল, “কে এখানে লক্ষ্য করবে ? তোর মনের ভুল।“

“আমি যখন ছোট ছিলাম একদিন রাতে ঘুম ভেঙে গেল। আমার শুধু মনে হতে লাগল কেউ একজন ঘরে আছে - আমাকে লক্ষ্য করছে। ভয়ে আমি গুটিশুটি মেরে শুয়ে রইলাম। সকালে উঠে দেখি চোর সবকিছু চুরি করে নিয়ে গেছে।“

জয়ন্ত পরিবেশটা হাল্কা করার জন্য বলল, “তোর যে এরকম অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা আছে আগে কখনো বলিসনি তো !“

“আগে কখনো দরকার পড়েনি।“

“ঠিক আছে ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখা যাক।“

“কীভাবে ?“

“কিছুক্ষণ সামনে হেটে হঠাৎ করে ঘুরে পেছনদিকে তাকাই - দেখি কাউকে দেখা যায় কি না।“

“ঠিক আছে।“

কথা না বলে তিনজনে বেশ কিছুক্ষণ হেঁটে গেল এবং হঠাৎ করে পেছনে ঘুরে কয়েক পা ছুটে গেল। ওরা অবাক হয়ে দেখল সত্যি সত্যি কী একটা প্রাণী দুদ্দাড় করে পেছনে ছুটে গিয়ে নিরাপদ দূরত্ব থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

শ্রবণী ভয়-পাওয়া গলায় বলল, “দেখেছিস ? দেখেছিস ? আমি বলেছি না !“

জয়ন্ত খানিকক্ষণ প্রাণীটার দিকে তাকিয়ে বলল, “এটা একটা বেজি। নেউল। ইংরেজিতে বলে উইজল।“

“নেউল ? বেজি ?“

“হ্যাঁ।“

শ্রাবণী ভুরু কুঁচকে বলল, “তুই কেমন করে জানিস ?“

“আমি জানি কারণ আমি বেজি দেখেছি। আমাদের গ্রামের বাড়িতে একজন মানুষ ছিল। তার একটা পোষা বেজি ছিল।“

“ও।“

“অসম্ভব হিংস্র প্রাণী। কিন্তু সাইজটা বেড়ালের মতো। কাজেই আমার মনে হয় তোর ভয় পাওয়ার কিছু নেই।“

“এরকম করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে কেন ?“

“মনে হয় আগে কোনো সুন্দরী মেয়ে দেখেনি।“

“ফাজলেমি করবি না। বাঁশ দিয়ে মাথায় একটা বসিয়ে দেব।“

“ঠিক আছে ফাজলেমি করব না।“

“দ্যাখ কীভাবে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে - যেন আমাদের কথা বুঝতে পারছে।“

“বুঝতে পারছে না। বেজি হচ্ছে বেজি। তাদের মানুষের কথা বোঝার কথা নয়।“

“তাহলে পালিয়ে যাচ্ছে না কেন ?“

“কৌতুহলে।“

“এত কৌতুহল কেন ?“

জয়ন্ত মাথা নেড়ে হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, “তুই কি বলতে চাইছিস এই বেজিটা দেখে আমাদের ভয়ে চিৎকার করতে করতে পালিয়ে যাওয়া উচিত ?“

“না, তা বলছি না।“ শ্রাবণী ইতস্তত করে বলল, “কিন্তু এটার ভাবভঙ্গি দেখে ভালো লাগছে না। হয়তো এটা পাগল - হয়তো এটা র‍্যাবিড।“

“ঠিক আছে আমি এটাকে তাড়িয়ে দিচ্ছি - “ বলে জয়ন্ত তার কিরিচ উচিয়ে বেজিটার দিকে ছুটে গেল। বেজিটা শেষমুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করল এবং একেবারে শেষমুহূর্তে পেছনের দুই পায়ের ওপর ভর দিয়ে প্রায় মানুষের মতো দাঁড়িয়ে পেছন দিকে লাফিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। জয়ন্ত স্বীকার না করে পারল না, বেজিটা একটু অস্বাভাবিক। এই ধরনের বুনা প্রাণী মানুষকে আরো অনেক বেশি ভয় পায়।

জয়ন্ত শ্রাবণীর কাছে এসে বলল, “হয়েছে তো ? তোর বেজি পালিয়েছে।“

শ্রাবণী মাথা নাড়ল, কিন্তু কোনো কথা বলল না।

তিনজন আবার হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে নিয়াজ চাপা গলায় বলল, “আমার ব্যাপারটা ভালো লাগছে না।“

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল, “কোন ব্যাপারটা ?“

নিয়াজ বলতে পারল না। প্রকৃত ব্যাপারটি যদি তারা জানত তাহলে তাদের কারোই ভালো লাগত না। তারা তখনো বুঝতে পারছিল না প্রতি পদক্ষেপেই তারা একটা বিশাল বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

আরো মিনিট দশেক হাঁটার পর হঠাৎ করে গাছপালা হালকা হয়ে তারা খোলা একটা জায়গায় চলে এল। ঘন অরণ্য থেকে বের হওয়ার কারণেই তাদের ভেতরের চাপা আতঙ্কের ভাবটা একটু কমে এসেছে। তারা চারিদিকে ঘুরে তাকাল এবং আবিষ্কার করল প্রায় এক কিলোমিটার দূরে একটা বাসা। এরকম একটি দ্বীপের জন্যে বাসাটি নিঃসন্দেহে আধুনিক। কিন্তু এতদূর থেকেও তাদের বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না যে বাসাটি দীর্ঘদিন থেকে অব্যাবহৃত হয়ে

পড়ে আছে। ঝোপঝাড়ে ঢেকে আছে, জানালা খোলা, দরজা ভাঙা এবং রঙ উঠে বিবর্ণ হয়ে আছে। নিয়াজ বলল, “ওটা নিশ্চয়ই পাগলা ডাক্তারের বাসা।“

“হ্যাঁ।“ শ্রাবণী মাথা নাড়ল, “ভদ্রলোক নিশ্চয়ই খুব শৌখিন ছিলেন। এরকম একটা নির্জন দ্বীপে কী চমৎকার বাসা তৈরি করেছেন দেখেছিস ?“

“শৌখিন এবং মালদার।“ জয়ন্ত বলল, “এরকম একটা নির্জন দ্বীপে এরকম একটা বসা তৈরি করতে অনেক মালপানি দরকার।“

শ্রাবণী কোনো কথা না বলে দূরে বাসাটির দিকে তাকিয়ে রইল। খানিক্ষণ পর বলল, “এতদূর যখন এসেছি তখন বাসাটি দেখে যাই।“

নিয়াজ ইতস্তত করে বলল, “চল তাহলে, দেরি করিস না।“

তিনজনের ছোট দলটা আবার রওনা দিল। একটু আগে সবাই মিলে যেভাবে সাবধানে হাঁটছিল, খোলামেলা জায়গায় এসে সেই সাবধানতাটুকু অনেক কমে গেল। তাড়াতাড়ি গিয়ে ফিরে আসার জন্যে এবারে নিয়াজ হাঁটছে সামনে - নিয়াজের পিছনে জয়ন্ত এবং সবার পিছনে শ্রাবণী।

হাঁটতে হাঁটতে নিয়াজ সম্ভবত একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল, বাংলোর মতো চমৎকার বাসাটির কাছাকাছি চলে এসেছে সেটাও দেখছিল একটু পরে পরে, তাই ঠিক কোথায় পা ফেলছে খেয়াল করেনি। হঠাৎ করে নিয়াজ আবিষ্কার করল, সামনের ঝোপঝাড় লতাপাতার আড়ালে মাটি নেই এবং সে একটা গর্তে পড়ে যাচ্ছে। নিজেকে বাঁচানোর সহজাত প্রবৃত্তিতে সে হাতের কাছে ঝোপঝাড় গাছপালা যেটাই পেল সেটাই ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু কোনটাই তার ওজনকে ধরে রাখার মতো শক্ত নয় এবং সে সবকিছু নিয়ে পড়ে যাচ্ছিল। ঠিক তখন জয়ন্ত আর শ্রাবণী ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলল। নিয়াজ আতঙ্কে চীৎকার করে হাত-পা ছুড়তে থাকে এবং আরেকটু হলে সে অন্যদেরকে টেনে নিয়ে গর্তে পড়ে যেত - কিন্তু শেষ মুহূর্তে তারা নিজেদের সামলে নিল। শ্রাবণী আর নিয়াজ কোনমতে নিয়াজকে গর্ত থেকে টেনে তুলল।

ঘটনার আকস্মিকতায় এত হতবাক হয়ে গেছে যে নিয়াজ প্রথমে কোনো কথা বলতে পারল না। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বলল, “বুবি ট্র্যাপ।“

“বুবি ট্র্যাপ ?“ জয়ন্ত ভুরু কুঁচকে বলল, “এই জঙ্গলে বুবি ট্র্যাপ কে বসাবে ?“

শ্রাবণী সাবধানে গর্তের কাছে এগিয়ে গেল। বেশ বড় গোলাকার একটা গভীর গর্ত। গর্তের ওপর লতাপাতা গাছপালা দিয়ে ঢাকা। উপর থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে এখানে এতবড় একটা গর্ত। শ্রাবণী মাথা নেড়ে বলল, “নিয়াজ ঠিকই বলেছে। আসলেই বুবি ট্র্যাপ।“

“এখানে বুবি ট্র্যাপ কে বসাবে ?“ জয়ন্ত সাবধানে পুরো জায়গাটা দেখে বলল, “এই দ্বীপে কোন মানুষ থাকে না।“

“হয়তো থাকে।“

“যদি থাকে তাহলে সে বুবি ট্র্যাপ বাসাবে কেন ?“ জয়ন্ত গর্তের উপর লতাপাতা গাছপালাগুলো দেখে বলল, “আমার মনে হয় এটা ন্যাচারাল ফেনোমেনন। এমনিতেই একটা বড় গর্তের উপর কিছু ঝোপঝাড় গজিয়েছে।“

“কোনো কারণ ছাড়াই ?“

“কারণ থাকলেও সেটা প্রাকৃতিক কারণ।“

জয়ন্তের ব্যাখ্যাটা কারোরই ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না - কিন্তু আপাতত সেটা গ্রহণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। শ্রাবণী খানিকক্ষণ গর্তটা পরীক্ষা করে নিয়াজকে জিজ্ঞেস করল, “তুই ব্যথা পাসনি তো ?“

নিয়াজ মাথা নাড়ল, “মনে হয় না। একটু-আধটু ছাল উঠে গেছে।“

শ্রাবণী তার ব্যাগ খুলে একটা মলম জাতীয় টিউব বের করে বলল, “নে, লাগিয়ে নে। এন্টিসেপটিকের কাজ করবে।“

নিয়াজ শুকনো গলায় বলল, “পড়ে গেলে কী হত ?“

“কী আর হত - দড়ি দিয়ে বেঁধে আমরা টেনে তুলে ফেলতাম।“

“মনে পড়ে জব্বার মিয়া বলেছিল গর্তের মাঝে পড়ে গিয়ে মরে গিয়েছিল ?“

“এই গর্তের ভেতর পড়লে কেউ মরে যায় না - বড়জোর হাত-পা ভেঙে যেত।“ শ্রাবণী আবার গর্তে ভেতর উঁকি দিয়ে হঠাৎ কী একটা দেখে আতঙ্কে চিৎকার করে পিছনে সরে গেল।

জয়ন্ত ভয় পাওয়া গলায় বলল, “কী ? কী হয়েছে ?“

“ভেতরে তাকিয়ে দ্যাখ।“

জয়ন্ত একটু এগিয়ে গিয়ে ভেতরে তাকাল। ভেতরে অন্ধকার, ভালো দেখা যায় না। সরসর করে একধরনের শব্দ হচ্ছে। সে রোদ থেকে চোখ আড়াল করে ভেতরে তাকিয়ে শিউরে

উঠল, এক মানুষ সমান একটি গর্তের নিচে কিলবিল করছে সাপ। একটি-দুটি সাপ নয় - অসংখ্য সাপ। জয়ন্ত নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। একধরনের আতঙ্ক নিয়ে সে নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে থাকে।

নিয়াজ অবাক হয়ে গুড়ি মেরে এগিয়ে এল, বলল, "কী ?"

জয়ন্ত ফিসফিস করে বলল,"সাপ।"

"সাপ ?"

"হ্যাঁ।"

"কী সাপ ?"

"জানি না - তাকিয়ে দ্যাখ।"

নিয়াজ রোদ থেকে চোখ আড়াল করে নিচে তাকিয়ে হতচকিত হয়ে গেল। কিছুক্ষণ সে নিশ্বাস নিতে পারে না। তারপর বড় একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "তোরা যদি আমাকে টেনে তুলতে না পারতি কী হত বুঝতে পারছিস ?"

জয়ন্ত মাথা নাড়ল।

"আমি আর এখানে এক সেকেণ্ডও থাকছি না। চল যাই।"

জয়ন্ত কোনো কথা না বলে যন্ত্রমুগ্ধের মতো গর্তের নীচে তাকিয়ে থাকে। নিয়াজ বলল, "কী হল ? কথা বলছিস না কেন ?"

"স্নেক-পীট। এটা হচ্ছে সাপের গর্ত - এখানে সাপেরা থাকে।"

"হ্যাঁ। সাপদের বাসা।"

"কিন্তু -"

"কিন্তু কী ?"

"গর্তের দেয়ালটা তাকিয়ে দেখ।"

"কী দেখব ?"

"দেখেছিস দেয়ালটা কত মসৃণ ? তার মানে এখান থেকে কোনো সাপ বের হতে পারে না।"

শ্রাবণী কয়েক হাত পিছনে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, "তুই কী বলতে চাইছিস ?"

"সাপগুলো যদি এখান থেকে বের হতে না পারে তাহলে ওরা খায় কী ?"

শ্রাবণী চোখ পাকিয়ে বলল, “সাপের লাঞ্চ ডিনার নিয়ে তোর এত মাথাব্যথা কেন ?“

“না“, জয়ন্ত একটু অধৈর্য হয়ে বলল, “বুঝতে পারছিস না - দেখে মনে হচ্ছে এখানে কেউ সাপগুলোকে পুষছে ?“

“একটু আগে তুই-ই না বললি এখানে কোন মানুষ নাই ?“

“সেইজন্যেই তো বুঝতে পারছি না।“

শ্রাবণী মাথা নেড়ে বলল, “সাপদের বের হওয়ার জন্যে লিফট লাগে না। তারা গর্ত দিয়ে বের হতে পারে। নিচে গর্ত আছে। আর না থাকলে তারা গর্ত করে নেবে।“

জয়ন্ত মাথা নাড়ল, বলল, “তা ঠিক। কিন্তু -“

“কিন্তু কী ?“

“দেখে মনে হয়, কেউ যেন খুব যত্ন করে একটা স্নেক-পীট তৈরি করেছে। দ্যাখ একবার তাকিয়ে দ্যাখ।“

শ্রাবণী মুখ শক্ত করে বলল, “জয়ন্ত, পৃথিবীতে রাজাকারদের পরে আমি যে-জিনিসটা ঘেন্না করি সেটা হচ্ছে সাপ। কাজেই তুই আমাকে সাপ দেখানোর চেষ্টা করবি না।“

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “ঠিক আছে, তোকে দেখানোর চেষ্টা করব না। কিন্তু এটা একটা ফ্যানটাসটিক জায়গা।“

নিয়াজ বলল, “আমার মতো আছাড় খেয়ে ভেতরে তো পড়িসনি তাই মনে হচ্ছে ফ্যানটাসটিক জায়গা।“

“ব্যথা তো পাসনি।“

“ব্যাথা না পেলে কী হবে ? ভয় পেয়েছি। ভয়। বুঝলি ?“

জয়ন্ত নিয়াজের কাঁধে হাত রেখে বলল, “আই অ্যাম সরি নিয়াজ। আমি খুব ইনসেনসেটিভ মানুষের মতো ব্যবহার করছি।“

“ঠিক আছে। এখন সেনসেটিভ মানুষের মতো ব্যবহার কর। এখান থেকে বের হ।“

জয়ন্ত পকেট থেকে সিগারেট বের করে মুখে লাগিয়ে সাবধানে ম্যাচ দিয়ে সিগারেটটা ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিয়ে দূরের বাসাটির দিকে তাকিয়ে বলল, “বাসাটার এত কাছে এসে না-দেখে চলে যাব ?“

নিয়াজ ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, “তোর এখনো শখ আছে ?“

“না মানে, এখন তো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। এরকম একটা গর্তে পড়ে গিয়ে মানুষ সাপের কামড় খেয়ে মারা যায়। এর মাঝে কোনো রহস্য নেই - কোনো ভৌতিক ব্যাপার নেই।“

“তুই কী বলতে চাইছিস ?“

“আমি বলছিলাম কী - এখন যেহেতু কারণটা জেনে গিয়েছি আমাদের তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ঐ বাসাটায় গিয়ে একটু ঘুরে দেখে আসি।“

নিয়াজ শ্রাবণীর দিকে তাকাল। শ্রাবণী বলল, “জয়ন্তের কথায় একটা যুক্তি অবশ্যি আছে। এতদূর যখন এসেছি বাসাটা দেখে যাই। দেখি পাগলা ডাক্তারের কোনো রহস্যভেদ করতে পারি কি না।“

জয়ন্ত বলল, “তুই নিশ্চিত থাক - এবার আমি সামনে সামনে যাব। লাঠি দিয়ে ঠুকে ঠুকে দেখব কোনো গর্ত আছে কিনা।“

নিয়াজ একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, “চল। কিন্তু তোদের বলে রাখছি, বাসাটায় যাব, ঢুকব আর বের হব।“

“ঠিক আছে।“

“ওয়ার্ড অব অনার ?“

জয়ন্ত নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, “ওয়ার্ড অব অনার।“

॥ চার ॥

তিনজনের ছোট দলটা বাসার সামনে এসে একধরনের মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। জংলী গাছপালায় পুরোটা ঢেকে গিয়েছে কিন্তু তবু বোঝা যায় একসময় এটি নিশ্চয়ই ছবির মতো একটা সুন্দর বাসা ছিল। দোতলা কাঠের বাসা। ওপরে একটি চমৎকার ডেক। এখানে বসে নিশ্চয়ই সমুদ্র দেখতে পাওয়া যায়। বাসাটি ঘিরে যত্ন করে গাছপালা লাগানো হয়েছিল। সেগুলো পুরো এলাকাটিকে ছায়া দিয়ে ঢেকে রেখেছে। একসময়ে একটা গেট ছিল। এখন সেখানে কিছু নেই। সুড়কি বিছানো ছোট একটা পথ।

তিনজন হেঁটে হেঁটে বাসাটির বারান্দায় এসে দাঁড়াল। জানালাগুলো খোলা। কাঁচ ভেঙে গিয়ে কেমন যেন অসহায় মানুষের মতো দাঁড়িয়ে আছে। জয়ন্ত দরজাটি ধাক্কা দিতেই সেটি ক্যাচ ক্যাচ শব্দ করে খুলে গেল। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে জয়ন্ত ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকে। দীর্ঘদিন কেউ না-আসায় ঘরের ভেতরে একধরনের ভ্যাপসা গন্ধ। জয়ন্ত সাবধানে চারিদিকে তাকিয়ে আরো কয়েক পা ভেতরে ঢুকে হাত দিয়ে অন্য দুজনকে ইঙ্গিত করতেই তারা ভেতরে ঢুকল।

ঘরটি একসময় নিশ্চয়ই খুব সুন্দর করে সাজানো ছিল, এখনো তার কিছু চিহ্ন রয়ে গেছে। তিনজন সাবধানে হেঁটে ঘরটিকে পরীক্ষা করে। একটি শেলফ কাত হয়ে পড়ে আছে। একটা টেবিল-ল্যাম্প একপাশে ভাঙা। একটা সুদৃশ্য চেয়ার। ঘরের দেয়ালে ধূলি-ধূসরিত একটা ওয়েল পেইন্টিং - শ্রাবণী কাছে গিয়ে ফুঁ দিতেই খানিকটা জায়গা পরিষ্কার হয়ে উজ্জ্বল রঙ বের হয়ে এল। শ্রাবণী দেয়ালে টাঙানো অন্য ছবিগুলো পরীক্ষা করে দেখল, এলোমেলো চুলের হাসিখুশি একজন মানুষ একটি বিদেশী মেয়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। শ্রাবণী বলল, “এটা নিশ্চয়ই পাগলা ডাক্তার।“

জয়ন্ত এগিয়ে এসে বলল, “তুই কেমন করে বুঝতে পারলি ?“

“দেখছিস না পাশে ফরেনার মেয়ে ?“

“পাশে ফরেনার মেয়ের সাথে পাগলা ডাক্তারের কী সম্পর্ক ?“

“আমাদের দেশের যত সাকসেসফুল মানুষ তাদের সবার বিদেশী বউ।“

“তোকে বলেছে !“

“বিশ্বেস করলি না ?“

“আর এই পাগলা ডাক্তার সাকসেসফুল কে বলেছে ? সাকসেসফুল মানুষ এরকম জঙ্গলে থাকে ? থেকে খুন হয়ে যায় ?“

শ্রাবণী দার্শনিকের মতো মুখভঙ্গি করে বলল, “বেঁচে থাকাটাই যদি জীবনের অর্থ হয়ে থাকে তাহলে কচ্ছপ হচ্ছে সবচে সবকসেসফুল। কয়েকশ বছর বেঁচে থাকে।“

নিয়াজ একটু অধৈর্য হয়ে বলল, “অনেক ফিলসফি হয়েছে। এখন চল যাই।“

জয়ন্ত বলল, “একটু অন্য ঘরগুলো দেখ যাই।“

“কথা ছিল ঢুকব এবং বের হব।“

“এই তো ঢুকেছি। এখন অন্যঘরগুলোতে ঢুকে বের হয়ে যাব।“

নিয়াজ হতাশ হওয়ার ভঙ্গিতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

নিচের সবগুলো ঘরই ধূলায় ধূসর। মাকড়শার জাল এবং পোকামাকড়ে ঢেকে আছে। কিছু ব্যবহারী জিনিস, দেয়ালে আরো কিছু ছবি, কয়েকটা আসবাবপত্র পাওয়া গেল। দেতলায় ওঠার সিঁড়িটা একটু নড়বড়ে মনে হল। জায়গাটা দিনের বেলাতেই অন্ধকার, তাই মোমবাতি দুটো জ্বালিয়ে নেয়া হল। তিনজন সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে। জয়ন্ত কয়েক পা উঠে বলল, “সিঁড়ি মনে হয় ঘুণ ধরে ক্ষয়ে গেছে। সাবধান।“

শ্রাবণী জিজ্ঞেস করল, “সাবধানটা কীভাবে হব ? ওজন কম করে দেব ?“

“তা বলছি না। নিচে দেখে পা ফেলিস। রেলিংটা শক্ত করে ধরে রাখিস। হঠাৎ করে ভেঙ্গে গেলে যেন আছাড় খেয়ে পড়ে না যাস।“

“নিয়াজের মতো !“

“হ্যাঁ, নিয়াজের মতো।“

নিয়াজ বিরক্ত কয়ে বলল, “ব্যাপারটা ফানি ছিল না। যদি পড়ে যেতাম তাহলে মরে যেতাম।“

শ্রারণী বলল, “এবং হকুনদিয়ার নামটি সার্থক হতো।“

উপরে উঠে একটা দরজা পাওয়া গেল। দরজাটি বন্ধ। জয়ন্ত কয়েকবার ধাক্কা দিয়ে বলল, তালা মারা রয়েছে।“

“আমাদের কাছে চাবি নেই - কাজেই এখন এটি মিশন ইমপসিবল।“

“জোরে একটা লাথি দিয়ে দেখি, তালা ভাঙতে পারি কি না।“

“একজনের বাসায় তালা ভেঙে ঢোকা আইনত দণ্ডনীয়।“

জয়ন্ত দাঁত বের করে হেসে বলল, “কিন্তু যদি সেই বাসাটা হয় হকুনদিয়ার পাগলা ডাক্তারের বাসা এবং সেই বাসায় গত পাঁচবছর কেউ ঢুকে না থাকে তাহলে সেটা আইনত দণ্ডনীয় নয়। সেটা ভদ্রতা -“

বলে জয়ন্ত একটু পিছিয়ে এসে প্রচণ্ড জোরে লাথি দিল। দীর্ঘদিনের অব্যবহারে মরচে পড়ে তালা নিশ্চয়ই নড়বড়ে হয়েছিল, জয়ন্তের লাথিতে তালা ভেঙে দরজা শব্দ করে ভেতরের দিকে খুলে যায়। শ্রাবণী চোখ বড় বড় করে বলল, “তোর পায়ে জোর তো ভালোই আছে। রাত্রিবেলা মানুষের ঘরের দরজা ভেঙে বেড়াস নাকি ?“

জয়ন্ত বুকে থাবা দিয়ে বলল, “হাফ ব্যাক, নাজিরপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন।“

নিয়াজ জয়ন্তকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে বিস্ময়সূচক শব্দ করল, বলল, “কী আশ্চর্য !“

জয়ন্ত এবং শ্রাবণী ভেতরে ঢুকে নিয়াজের মতোই চমৎকৃত হয়ে যায়। ভেতরে অত্যন্ত চমৎকার আধুনিক একটি ল্যাবরেটরি। চমৎকার শ্বেতপাথরের টেবিল। দামি মাইক্রোস্কোপ। উপরে তাকে কাচের শেলফ। টেবিলের পাশে ছোট ফ্রিজ, হিটার সেন্ট্রিফিউজ। পাশে শেলফে সারি সারি বই খাতা, নোট বই।

শ্রাবণী অবাক হয়ে বলল, “এই ল্যাবরেটরিটা দেখি একেবারে চকচক করছে।“

“দরজা জানালা সব বন্ধ ছিল বলে নষ্ট হয়নি।“

“কী সুন্দর ল্যাবরেটরি দেখেছিস ?“ নিয়াজ মুগ্ধ হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে বলল, “এরকম একটা জঙ্গুলে জায়গায় কেউ এরকম ল্যাবরেটরি তৈরি করতে পারে ?“

নিয়াজ হাতের মোমবাতিটা নিয়ে শেলফের দিকে এগিয়ে গিয়ে একটা বই টেনে নেয়। ধূলা ঝেড়ে বইটা দেখে বলল, “জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙের বই।“

“তার মানে পাগলা ডাক্তার একজন জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ার ছিল ?“

নিয়াজ বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠায় হাতে-লেখা নামটি পড়ে বলল, “পাগলা ডাক্তারের ভালো নাম মাজেদ খান। ড. মাজেদ খান।“

“এরকম সুন্দর একটা নাম থাকার পরও তাকে সবাই পাগলা ডাক্তার ডাকে কেন ?“

"আমাকে জিজ্ঞেস করিস না। আমি এই নাম দিইনি।" নিয়াজ শেলফ থেকে আরো কয়েকটা বই নামিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। নিয়াজ পড়াশোনা সংক্রান্ত ব্যাপারে খুব উৎসাহী। কোনো বই পেলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে না-দেখে নামিয়ে রাখে না। যদিও একটু আগে সে চলে যাবার জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল কিন্তু হঠাৎ করে বই এবং কাগজপত্র দেখে সে খুব উৎসাহী হয়ে উঠে। মোমবাতিটা টেবিলে বসিয়ে সে কাগজপত্র বের করে দেখতে থাকে। জয়ন্ত একটা মাইক্রোস্কোপের ধূলা ঝেড়ে চোখ লাগিয়ে দেখার চেষ্টা করে। শ্রাবণী একধরনের বিস্ময় নিয়ে ঘরের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে থাকে। তার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে এরকম একটি নির্জন দ্বীপে একজন মানুষ এরকম চমৎকার একটি ল্যাবরেটরি দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারে।

নিয়াজ বই এবং কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ করে বলল, "এই দ্যাখ ! কী পেয়েছি।"

"কী ?" জয়ন্ত মাইক্রোস্কোপ থেকে চোখ তুলে নিয়াজের দিকে তাকাল।

"ডায়েরি।"

"ডায়েরি ? শ্রাবণী নিয়াজের দিকে এগিয়ে এল।

"হ্যাঁ। পার্সোনাল ডায়েরি।" নিয়াজ পৃষ্ঠাগুলো ওল্টাতে থাকে এবং হঠাৎ করে সেখান থেকে ভাঁজ-করা একটা কাগজ নিচে পড়ল। শ্রাবণী কাগজটা তুলে নিয়ে ভাঁজ খুলে তাকায়, ভেতরে টানা হাতে কিছু একটা লেখা। শ্রবণী কৌতুহলী হয়ে মোমবাতির আলোতে পড়ার চেষ্টা করে। মানুষটির হাতের লেখা সুন্দর হলেও পড়তে কষ্ট হয়।

সম্ভবত লিখেছে খুব তাড়াহুড়ো করে। সেজন্যে পড়তে শ্রাবণীর সময় লাগল। পড়ে হঠাৎ করে শ্রাবণীর ভুরু কুঞ্চিত হয়ে উঠে। সে কাঁপা গলায় বলল, "কী লেখা এখানে ?"

নিয়াজ মুখ তুলে তাকাল, বলল, "কী লেখা ?"

শ্রাবণী ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "পড়ে-দ্যাখ।"

নিয়াজ কাগজটি হাতে নিয়ে মোমবাতির আলোতে পড়ার চেষ্টা করে। সেখানে লেখা, "এ আমি কী করেছি ! একজন একজন করে সবাইকে খুন করেছে - এখন কি আমার পালা ? কেউ যদি ভুল করে এই দ্বীপে চলে আসে তার কী হবে ?"

ওরা একজন আরেকজনের দিকে তাকাল। জয়ন্ত ফিসফিস করে বলল, "কী লিখেছে এখানে ? কে খুন করেছে ? কাকে খুন করেছে ?"

নিয়াজ ডায়েরির পৃষ্ঠা ওল্টাতে থাকে। পেছন থেকে কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে। তারপর কিছু পৃষ্ঠা আগে চলে আসে। হঠাৎ করে সে মুখ তুলে তাকায়। মোমবাতির আলোতে দেখায় তার মুখ ভয়ে রক্তশূন্য হয়ে আছে। শ্রাবণী ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "কী লেখা আছে ডায়েরিতে ?"

"বেজি !"

"বেজি ? কী হয়েছে বেজির ?"

"এই বেজিগুলো সাধারণ বেজি নয়। মাজেদ খান ইঞ্জিনিয়ারিং করে ওদের মাঝে বুদ্ধিমত্তার একটা জিন ঢুকিয়ে দিয়েছে।"

"কী বলছিস তুই !"

"হ্যাঁ। এই দ্যাখ।" নিয়াজ ডায়েরির পৃষ্ঠা খুলে পড়ে শোনাল, "সুইডেনের ক্রাঙ্গ লেবরেটরিতে প্রফেসর সোয়াঙ্গন যে এক্সপেরিমেন্টটি করেছেন আমি আজকে সেটি করেছি। বেজির যে-ক্লোনটি তৈরি করেছি তার তিন নম্বর ক্রমোজমে বুদ্ধিমত্তার জিনটিতে মানুষের বুদ্ধিমত্তার জিনটি বসিয়ে দিয়েছি। জানিনা এই ভ্রূনটা ঠিকভাবে বড় হবে কি না - যদি বড় হয় তাহলে প্রথম একটা স্তন্যপায়ী প্রাণীর মাঝে মানুষের এরকম একটা জিন ঢুকিয়ে দেয়া হল।"

নিয়াজ মুখ তুলে তাকাল। কাঁপা গলায় বলল, "তার মানে বুঝতে পারছিস ? মাজেদ খান এখানে কিছু বেজি তৈরি করেছে যেগুলোর বুদ্ধিমত্তা মানুষের মতো -"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলল, "কী বলছিস পাগলের মতো ?"

"আমি পাগলের মতো বলছি না, এই দ্যাখ মাজেদ খান কি লিখেছে।" নিয়াজ ডায়েরির আরো কিছু পৃষ্ঠা উল্টিয়ে পড়তে থাকে। "বেজিটির বুদ্ধিমত্তা অন্য বেজি থেকে বেশি কি না সেটা আজকে প্রমাণিত হয়ে গেল। বেজিটি খাঁচা থেকে পালিয়ে গেছে। এই খাঁচা থেকে কোনোভাবে বেজিটির পালিয়ে যাবার কথা নয়। কারণ বুদ্ধিমত্তাহীন কোনো প্রাণী এই খাঁচার ছিটকিনি খুলতে পারবে না। শুধুমাত্র অত্যন্ত উন্নত শ্রেনীর বুদ্ধিমত্তা আছে এরকম একটা প্রাণীই ছিটকিনি খুলে বের হয়ে যেতে পারে। কাজটি খুব ভুল হয়ে গেল। সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রাণী ছাড়া পেয়ে গেল। এখন এটি যদি তার বাচ্চাদের মাঝে এই বুদ্ধিমত্তার জিন ছড়িয়ে দেয় ? তারা যদি নতুন বাচ্চার জন্ম দেয় ? এই পুরো দ্বীপটি বুদ্ধিমান বেজি দিয়ে ভরে উঠে ?"

শ্রাবণী ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "তার মানে আমাদের পিছু-পিছু যে বেজিটা আসছিল সেটা মানুষের মতো বুদ্ধিমান ?"

কেউ শ্রাবণীর কথার উত্তর দিল না। নিয়াজ ডায়েরির পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, "এই দ্যাখ কী লেখা - আমি এই দ্বীপের সব বেজিগুলো মারার চেষ্টা করেছি। গুলি করে মারার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সেই বুদ্ধিমান বেজিকে মনে হয় মারতে পারিনি। আজকে প্রথম কিছু বেজির বাচ্চাকে পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে ছুটে যেতে দেখলাম। তাহলে কি বুদ্ধিমান নতুন বেজির বাচ্চার জন্ম হয়েছে ? সর্বনাশ ! এখন কী হবে ? আমি বেজিগুলোকে মারার চেষ্টা করেছি বলে আমাকে শত্রু হিসেবে ধরে নিয়েছে। এই বেজিগুলো কি এখন থেকে আমাকে কিংবা সব মানুষকে শত্রু হিসেবে বিবেচনা করবে ?"

মোমবাতির আলোতে সবাই চুপ করে বসে থাকে। কেউ কোনো কথা বলতে পারে না। নিয়াজ ডায়েরির পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ করে থেমে গিয়ে আবার পড়তে শুরু করল, "বেজিদের একটি বুদ্ধিমান প্রজন্মের জন্ম হলে তারা কী করবে ? সবার আগে নিজেদের খাবার সংগ্রহের ব্যাপারটি নিশ্চিত করবে। আজকে আমি তাই আবিষ্কার করেছি। তারা একটি বড় গর্ত করে সেখানে সাপদের এনে জড়ো করেছে। আমি জানতাম না সাপ তাদের এত প্রিয় খাবার। সাপগুলো বাঁচিয়ে রাখার জন্যে ইঁদুর ধরে এনে গর্তের মাঝে ছেড়ে দিচ্ছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার।"

নিয়াজ মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, "এখন বুঝতে পারছিস আমি যেই গর্তটাতে পড়তে যাচ্ছিলাম সেটা কোথা থেকে এসেছে ?

"হ্যাঁ। বুঝতে পেরেছি।"

শ্রাবণী ভয় পাওয়া গলায় বলল, "এখন কী হবে ?"

জয়ন্ত অনিশ্চিতের মতো মাথা নাড়ল, বলল, "আমি জানি না।" সে ধীরে ধীরে দরজার কাছে হেঁটে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ভেতর থেকে ছিটকিনি আটকে দিল। অন্য দুজন এক ধরনের আতঙ্ক নিয়ে জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ করে ছিটকিনি আটকে দিয়ে তারা প্রথমবার স্বীকার করে নিল এখানে তারা একটা ভয়ঙ্কর বিপদের মুখোমুখি এসে পড়েছে।

নিয়াজ ডায়েরির পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ করে থেমে গিয়ে আবার পড়তে শুরু করল, "বুদ্ধিহীন প্রাণী চলে সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে কিন্তু বুদ্ধিমান প্রাণী নতুন জিনিস শিখতে পারে। এই বেজিগুলো বুদ্ধিমান। তারা প্রতিদিন নতুন জিনিস শিখছে। আজকে আবিষ্কার করলাম, বেজিগুলো আমার পোষা কুকুরটিকে মেরে ফেলেছে। রাত্রিবেলা কুকুরটার চিৎকার শুনে আমি বন্দুক নিয়ে ছুটে বের হয়ে গেছি। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। বেজিগুলো জানে -

একটা প্রাণীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে তার দৃষ্টি। কাজেই সবার আগে সেগুলো কুকুরটার উপর ঝাপিয়ে পড়ে তার চোখদুটো খুবলে তুলে নিয়েছে। তার পরের অংশটি সহজ। বেজিগুলো ধারালো দাঁত দিয়ে কুকুরের ঘাড়ের বড় আর্টারিটা ছিন্ন করে দিয়েছে। কী নৃশংস ! বেজিগুলো তাদের থেকে অনেক বড় প্রানীকে হত্যা করতে শিখে গেছে - এখন কি আমাদের হত্যা করবে ?

আমার ল্যাবরেটরি এসিসটেন্ট খুব ভয় পেয়েছে। ভয় পাওয়ারই কথা।“

নিয়াজ ডায়েরি থেকে মুখ তুলে বলল, “মনে আছে জব্বার মিয়া কী বলেছিল ?“

“কী বলেছিল ?“

“চোখদুটো সাবধান।“

“হ্যাঁ। মনে আছে -“

“এখন বুঝেছিস তো কেন ?“

কেউ কোন কথা না বলে নিয়াজের দিকে তাকিয়ে রইল। নিয়াজ ডায়েরির পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ করে থেমে যায়। একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে আবার পড়তে শুরু করল, “আজকে আমার ল্যাবরেটরি এসিস্টেন্ট খুন হয়ে গেল। মৃতদেহটি বাসার সামনে পড়েছিল। চোখদুটো খুবলে নিয়ে ঘাড়ের বড় আর্টারিগুলো ধারালো দাঁত দিয়ে কেটে নিয়েছে। কাজটি করেছে প্রায় নিঃশব্দে। আমি রাতে কোন শব্দও শুনতে পারিনি। তাকে আমি ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু সে আমার কথা না-শুনে ঘর থেকে বের হয়েছিল। কেন বের হল ? আমার ধারণা বেজিগুলো কোনো একটা বুদ্ধি বের করে তাকে বের করে নিয়েছে। এখন এই দ্বীপে আমি একা। আমার ধারণা বাইরে থেকে কোনো সাহায্য না পেলে আমার অবস্থাও আমার ল্যাবরেটরি এসিস্টেন্টের মতো হবে।“

নিয়াজ আবার মুখ তুলে তাকাল। জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল, “ডায়েরি কি এখানেই শেষ ?“

“না। আরো কয়েক পৃষ্ঠা আছে।“

“কী লেখা আছে এখানে ?“

নিয়াজ পড়তে শুরু করে, “বুদ্ধিমান প্রাণীর প্রথম চেষ্টাটাই হল তার বুদ্ধিমত্তাকে ছড়িয়ে দেওয়া। কাজেই এই-বেজিগুলো যে সেরকম চেষ্টা করবে সে-ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। এই দ্বীপের যেদিকেই তাকাই সেদিকেই আমি বেজিগুলোকে দেখতে পাই। নিষ্পলক দৃষ্টিতে দূর থেকে আমাকে লক্ষ্য করে। দৃষ্টিগুলো দেখে আমার বুক কেঁপে ওঠে। আমি

আজকাল ঘর থেকে বের হই না। মাথার কাছে লোডেড বন্দুক রাখি। কিন্তু কেন জানি মনে হয়, এই বন্দুক আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। আমার মনে হয়, এটি খুব বড় সৌভাগ্য যে বেজিগুলো এই দ্বীপের মাঝে আটকা পড়ে আছে। এখান থেকে অন্য দ্বীপে কিংবা দেশের মূল ভূখণ্ডে যেতে পারছে না। যদি একবার চলে যায় তখন কী হবে ! পৃথিবীর মানুষ আমাকে যেন ক্ষমা করে।"

"আমার মনে হয় প্রাণীটা বুদ্ধিমান হবার পর নিশ্চয়ই তারা ভাব বিনিময় করার জন্যে নিজেদের একটা ভাষা আবিষ্কার করেছে। ডেকের ওপর বসে আমি বাইনোকুলার দিয়ে চারপাশের বেজিগুলোকে দেখি। মনে হয় এগুলো এখন নিজেদের মাঝে কথা বলছে। মনে হচ্ছে বেজিগুলোর নিজস্ব কোনো ভাষা আছে। শুধু-যে ভাষা আঝে তা নয় - মনে হয় সামনের পা দুটোকে হাত হিসেবে ব্যাবহার করার চেষ্টা করে। আজকাল আমাকে খুব সাবধান থাকতে হয় - মনে হয় বেজিগুলো ঘরের ছিটকিনি খুলে ভেতরে ঢুকে যেতে পারে।"

"যে-জিনিসটি এখনো বেজিগুলো শিখেনি সেটা হচ্ছে আগুনের ব্যবহার। তাহলে কি এই আগুন দিয়েই কোনোভাবে এদের ধ্বংস করতে হবে ? আমি জানি না।"

"আমার কী হবে আমি জানি না। আমি যে ভুল করেছি সেজন্যে ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন।"

নিয়াজ ডায়েরিটা বন্ধ করে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, "ডায়েরিটা এখানেই শেষ।"

কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। মোমবাতির আলোটি স্থির হয়ে ছিল, মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে, দেয়ালে তাদের বড় ছায়া পড়েছে। শ্রাবণী কাঁপা গলায় বলল, "এখন কী হবে ?"

"মাজেদ খানের একটা বন্দুক ছিল, সে পুরো ব্যাপারটা জানত তারপরও নিজেকে বাঁচাতে পারে নাই। আমরা কেমন করে বাঁচব ?" নিয়াজ সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের কোনো আশা নেই।"

"সব আমার দোষ।" জয়ন্ত মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "আমি যদি তোদের জোর করে নিয়ে না আসতাম -"

"ওসব বলে লাভ নেই।" শ্রাবণী মাথা নেড়ে বলল, "এখন কী করা যায় সেটা বল।"

"এমন কী হতে পারে যে আমরা শুধু শুধু ভয় পাচ্ছি ?"

"মানে ?"

“এই-যে বুদ্ধিমান বেজির ব্যাপারটা - আসলে এটা খানিকটা বাড়াবাড়ি। আসলে সেরকম কিছু নেই। একটা বেজি আর কত বিপজ্জনক হবে ? এইটুকু একটা জন্তু -“

নিয়াজ এবং শ্রাবণী নিশব্দে জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে রইল। জয়ন্ত বলল, “আগেই কেন ভয়ে কাবু হয়ে থাকব ? ব্যাপারটা দেখা যাক। এই ডায়েরিটা পাঁচ বছর আগের লেখা, পাঁচবছরে কত কী হতে পারে।“

“উল্টোটাও হতে পারে।“ নিয়াজ বলল, “পাঁচবছর আগে এটা যত ভয়ঙ্কর ছিল এখন হয়তো আরো অনেক বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে।“

“হ্যাঁ। উল্টোটাও হতে পারে - কিন্তু আগেই সেটা ধরে নেব কেন ? এই-যে আমরা তিনজন হেঁটে হেঁটে এসেছি, আমাদের কিছু হয়েছে ? সত্যিই যদি ভয়ঙ্কর বেজি আক্রমণ করে মানুষকে মেরে ফেলতে পারত - তাহলে আমাদের মারল না কেন ?“

“তা ঠিক।“ নিয়াজ মাথা নেড়ে বলল, “তাহলে তুই কী করতে চাস ?“

“প্রথমে এখান থেকে বের হয়ে বাসাটা দেখি। কী হচ্ছে না হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করি। এখন মনে হচ্ছে জব্বার মিয়ার বন্দুকটা নিয়ে এলে খারাপ হত না।“

“মাজেদ খানের একটা বন্দুক ছিল, সেটা খুঁজে দেখলে হয়।“

শ্রাবণী ভুরু কুঁচকে বলল, “তুই কখনো বন্দুক দিয়ে গুলি করেছিস ?“

“না। কিন্তু সেটা আর কত কঠিন হবে ?“

“একটা নাকি ধাক্কা লাগে - বেকায়দা ধাক্কা লেগে নাকি মানুষ উল্টে পড়ে।“

“ধুর। বাজে কথা। পুঁচকে পুঁচকে সন্ত্রাসীরা বন্দুক দিয়ে কাটা রাইফেল দিয়ে গুলি করছে না ?“

“তুই তো আর সন্ত্রাসী না। সন্ত্রাসী হলে তো আর চিন্তা ছিল না।“

“যাই হোক -“ নিয়াজ বলল, “এখন আর সেটা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। আমাদের কাছে বন্দুক নাই, আছে বাঁশের লাঠি, সেটা হাতে নিয়ে বের হতে হবে।“

“হ্যাঁ।“ জয়ন্ত লাঠিটা হাতে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

সাবধানে দরজা খুলে তারা ল্যাবরেটরি-ঘর থেকে বের হয়। একটা ছোট করিডোর ধরে হাঁটতে থাকে। পাশাপাশি কয়েকটা ঘর, একটা সম্ভবত স্টোর রুম, একটা লাইব্রেরি, আরেকটা ছোট বিশ্রাম করার ঘর। করিডোরের একপাশে দরজা, দরজা খুলে সম্ভবত বারান্দায় যাওয়া

যায়। দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করে জয়ন্ত দরজা খুলে বের হয়ে এল। ভেতরে অন্ধকার থেকে হঠাৎ প্রখর আলোতে এসে তাদের সবার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। মোমবাতিগুলো ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে তারা বারান্দার রেলিঙের কাছে এগিয়ে যায় - ভালো করে দেখার জন্যে তাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। উজ্জ্বল আলোতে চোখ সয়ে যাবার পর তারা আবিষ্কার করল এই বারান্দাটি থেকে একপাশে সমুদ্রের চমৎকার একটি দৃশ্য দেখা যায়, অন্যপাশে দ্বীপের গাছগাছালি। তাদের মনের ভেতরে বেজি নিয়ে ভয়ঙ্কর দুর্ভাবনাটি না থাকলে নিঃসন্দেহে এখানে দাঁড়িয়ে তারা দৃশ্যটি উপভোগ করত। তারপরও তারা সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। শ্রাবণী হেঁটে বারান্দার অন্যপাশে এসে বনের দিকে তাকিয়ে থাকে। বড় বড় গাছ, গাছের নিচে ঝোপঝাড়। গাছপালা ঝোপঝাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শ্রাবণী একধরনের অস্বস্তি বোধ করে, অস্বস্তিটি ঠিক কেন বোধ করছে সে ধরতে পারে না - তার শুধু মনে হয় ওখানে কিছু-একটা জিনিস ঠিক নেই। শ্রাবণী রেলিঙে ঝুকে পড়ে আরো তীক্ষ্ণচোখে তাকাল, হঠাৎ করে মনে হল গাছের নিচে ঝোপের আড়ালে কিছু একটা যেন নড়ে উঠেছে। শ্রাবণী তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে হঠাৎ ভয়ানকভাবে চমকে উঠে। বাসাটি ঘিরে গাছপালাগুলোর নিচে যতদূর চোখ যায় অসংখ্য বেজি নিশ্চল হয়ে বসে আছে। এতদূর থেকে বোঝা যায় না কিন্তু তাদের ছোট ছোট কুতকুতে চোখ তাদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে নিবদ্ধ হয়ে আছে। শ্রাবণী আতঙ্কে একটা আর্ত চিৎকার করে উঠল এবং সেই চিৎকার শুনে নিশ্চল বেজিগুলো একসাথে পেছনের দুই পায়ের ওপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

জয়ন্ত কাঁপা গলায় বলল, “কী হয়েছে ?“

শ্রবণী হাত তুলে দেখাল, “ঐ দেখ।“

জয়ন্ত এবং নিয়াজ তাকিয়ে দেখে বাসাটি ঘিরে কয়েক হাজার বেজি পেছনের পায়ের ওপর ভর দিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে স্থিরচোখে তাদের তিনজনের দিকে তাকিয়ে আছে।

॥ পাঁচ ॥

"আমরা যখন হেঁটে আসছিলাম - এই কয়েক হাজার বেজি ইচ্ছে করলে আমাদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারত।" শ্রাবণী বলল, "কেন করেনি কে জানে।"

জয়ন্ত কিংবা নিয়াজ কোনো কথা বলল না।

"একটি দুটি খ্যাপা জন্তু-জানোয়ার থেকে রক্ষা পাওয়া যায় - কিন্তু এরকম কয়েক হাজার থেকে রক্ষা পাবে কেমন করে ?"

নিয়াজ একটু নড়েচড়ে বলল, "জব্বার মিয়া। আমাদের একমাত্র ভরসা জব্বার মিয়া।"

শ্রাবণী বলল, "কীভাবে ?"

জব্বার মিয়া এসে যখন দেখবে আমরা নেই - তখন আমাদের খোঁজ নেয়ার একটা ব্যবস্থা করবে না ?"

"সেটা কখন করবে ? ততক্ষণ আমরা কী করব ?"

"ততক্ষণ যেভাবেই হোক আমাদের বেঁচে থাকতে হবে।"

জয়ন্ত এতক্ষণ চুপচাপ ওদের কথা শুনছিল। এবারে সোজা হয়ে বসে বলল, "দ্যাখ - আমরা মনে হয় ব্যাপারটাকে একটু বেশি মেলোড্রামাটিক করে ফেলছি। বাইরে যে-প্রাণীটা দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই প্রাণীটা কী ? প্রাণীটা হচ্ছে বেজি। একটা বেজির ভয়ে আমরা আকুপাকু করব সেটা ঠিক হচ্ছে না -"

শ্রাবণী বাধা দিয়ে বলল, "একটা নয় - কয়েক হাজার -"

জয়ন্ত প্রায় নাটকের ভঙ্গিতে পা দিয়ে শব্দ করে বলল, "কয়েক হাজার হোক আর কয়েক লক্ষ হোক তাতে কিছু আসে যায় না। বেজি হচ্ছে বেজি। আমি এই লাঠি দিয়ে পিটিয়ে এদের বারোটা বাজিয়ে দেব।"

অনেকক্ষণ পর শ্রাবণীর মুখে হাসি ফুটে উঠল, বলল, "শুনে খুশি হলাম। এই পিটানোর কাজটা কখন শুরু করবি ? এখনই বের হবি লাঠি হাতে ?"

জয়ন্ত একটু ক্রুদ্ধ চোখে শ্রাবণীর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই ঠাট্টা করছিস ? এটা ঠাট্টার সময় ?"

শ্রাবণী বলল, “আই অ্যাম সরি। তুই ঠিকই বলেছিস - এটা ঠাট্টার সময় নয় - কিন্তু তুই একটা লাঠি নিয়ে ইয়া-আলী বলে লাফঝাঁপ দিয়ে বেজি মারছিস, দৃশ্যটা কল্পনা করে কেমন জানি হাসি পেয়ে গেল।“

জয়ন্ত কোনো কথা না বলে একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, “আমি বিশ্বাস করতে পারি না একজন মানুষ এরকম সময়ে ঠাট্টা করতে পারে।“

নিয়াজ বলল, “এটা দোষের ব্যাপার না, এরকম একটা সময়ে যে ঠাট্টা করতে পারে বুঝতে হবে তার মাথা ঠাণ্ডা - বিপদের সময় সে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।“

জয়ন্ত কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, “তা ঠিক।“

“কাজেই এখন ঠাণ্ডা মাথায় পুরো ব্যাপারটা ভেবে দেখা যাক।“ নিয়াজ শ্রাবণীর দিকে তাকিয়ে বলল, “তুই শুরু কর।“

“আমি ? আমি কেন ?“

“এক্ষুনি না প্রমাণ করে দিলাম যে তোর মাথা সবচেয়ে ঠাণ্ডা।“

“আমার মাথা ঠাণ্ডা না। কখনো ছিল না। তোর প্রমাণে গোলমাল আছে।“

“ঠিক আছে, জয়ন্ত তাহলে তুই বল।“

জয়ন্ত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,“প্রথমে উপরতলাটা সিকিউর করতে হবে যেন ঐ বদমাইশ বেজিগুলো উপরে আসতে না পারে।“

“সেটা কীভাবে করবি ?“

“নিচের দরজা উপরের দরজা সবকিছু বন্ধ রেখে।“

“তারপর ?“

“তারপর এই পুরো বাসাটি খুঁজে দেখতে হবে কী কী জিনিসপত্র আছে। সেই জিনিসপত্র দিয়ে একটা নতুন প্ল্যান করতে হবে।“

“ভেরি গুড।“

“বন্দুকটা খুঁজে পেলে খারাপ হয় না।“

“যদি না পাই ?“

“তাহলে আপাতত আমাদের হাতে একমাত্র অস্ত্র হচ্ছে এই ম্যাচটা।“ জয়ন্ত পকেট থেকে ম্যাচটা বের করে বলল, “যদি সিগারেট না খেতাম তাহলে এই ম্যাচটাও থাকত না।“

“তাহলে আপাতত পরিকল্পনা হচ্ছে এই বাসাটিকে দুর্গের মতো ব্যবহার করে থাকা ?“

জয়ন্ত শ্রাবণীর দিকে মাথা নেড়ে বলল, “হ্যাঁ।“

“খাওয়াদাওয়া ?“

“তুই যদি কিছু না এনে থাকিস তাহলে বন্ধ।“

“আমি কোত্থেকে আনব ?“ ব্যাগ হাতড়ে কয়েক টুকরো চকলেট বের করে বলল, “এই হচ্ছে একমাত্র ফুড সাপ্লাই।“

নিয়াজ বলল, “আমরা নিশ্চয়ই এখানে মাসখানেক থাকার পরিকল্পনা করছি না - বড় জোর আজকের দিনটা।“

“তা ঠিক।“ জয়ন্ত দুর্বলভাবে হেসে বলল, “কিন্তু খাওয়ার কথা বলতেই কেমন জানি খিদে পেয়ে গেল !“

নিয়াজ হাসার চেষ্টা করে বলল, “শুধু-শুধু খাওয়ার কথা চিন্তা না করে কাজে লেগে যাওয়া যাক।“

“হ্যাঁ।“ জয়ন্ত বলল, “একজনকে সবসময় থাকতে হবে বারান্দার কাছাকাছি। বেজির গুষ্টি কোনো বদমাইশি করার চেষ্টা করলেই অন্যদের জানিয়ে দেবে।“

শ্রাবণী বলল, “আমি বসে বসে এই বেজির বাচ্চাগুলো দেখতে পারব না। তোরা কেউ দ্যাখ।“

জয়ন্ত বলল, “ঠিক আছে, আমি দেখছি। তোরা ল্যাবরেটরি, স্টোর রুম, রেস্ট এরিয়া খুঁজে দেখ কী কী পাওয়া যায়।“

“কোনো বিশেষ কিছু খুঁজব নাকি ?“

“একটা মেশিনগান হলে মন্দ হয় না !“

জয়ন্তের কথা শুনে দুজনেই শব্দ করে হাসল এবং হঠাৎ করে বুঝতে পারল দীর্ঘ সময় পর এই প্রথমবার তারা হাসছে। আনন্দহীন হাসি - কিন্তু তবুও হাসি।

ল্যাবরেটরিতে বেশ কিছু জিনিসপত্র পাওয়া গেল - যেমন বেশ কিছু সলভেন্ট, এগুলো দিয়ে এই মুহূর্তে কোনোকিছু পরিষ্কার করার প্রয়োজন নেই - কিন্তু বিশাল একটা আগুন জ্বালানোর জন্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। বড় বড় কয়েকটা কাচের বোতলে কিছু এসিড এবং ক্ষার পাওয়া গেল। ড্রয়ারে প্রচুর সিরিঞ্জ রয়েছে। সিরিঞ্জের ভেতরে এই এসিড কিংবা ক্ষার ভরে

কিছু ভয়ানক অস্ত্র তৈরি করা যেতে পারে।এছাড়াও ধারালো ব্লেড এবং চাকু রয়েছে। রবারের গ্লাভস রয়েছে প্রচুর। যদিও দীর্ঘদিন পড়ে থাকার কারণে খানিকটা আঠা আঠা হয়ে আছে। ওরা সবচে খুশি হলো চোখের ওপর পরার জন্যে প্লাষ্টিকের গগলস পেয়ে - পাজি বেজিগুলো যদি চোখের ওপর হামলা চালাতেই বেশি পছন্দ করে তাহলে এগুলো কাজে লাগবে।

ল্যাবরেটরির ড্রয়ারে তারা একটা বাইনোকুলার পেয়েই সেটা সাথে সাথে জয়ন্তকে দিয়ে এল - বেজিগুলোর কাজকর্ম এখন খুব ভালোভাবে দেখা যাবে।

স্টোররুমে অনেক ধরনের ব্যাবহারি জিনিস পাওয়া গেল। মোমবাতি দুটি শেষ হয়ে আসছিল, সৌভাগ্যক্রমে সেখানে কয়েক বাক্স মোমবাতি পাওয়া গেল। নাইলনের দড়ি, স্ক্রু ড্রাইভার, করাত-হাতুড়ি এ-ধরনের বেশকিছু প্রয়োজনীয় জিনিসও ছিল। বেশকিছু ব্যাটারি ছিল কিন্তু সেগুলো কোনো কাজে আসবে না - নষ্ট হয়ে ভেতর থেকে আঠালো ক্যামিকেল বের হয়ে আসছে।

তবে সবচেয়ে দরকারি জিনিসটা তারা পেয়ে গেল বিশ্রাম নেবার ঘরে। সোফার কুশনের নিচে লুকিয়ে রাখা একটা দোনলা বন্দুক এবং ড্রয়ারের ভেতরে বন্দুকের গুলি। বন্দুকটা হাতে নিয়ে নিয়াজের মুখে হাসি ফুটে ওঠে, যুদ্ধবাজ জেনারেলের মতো বন্দুকটা উপরে তুলে বলল, “এবারে দেখে নেব বেজির বাচ্চা বেজিদের।“

শ্রবণী বলল, “এভাবে কথা বলিস না - তোকে সন্ত্রাসীর মতো দেখাচ্ছে।“

নিয়াজ মাথা নেড়ে বলল, “বন্দুক জিনিসটা নিশ্চয়ই খারাপ। হাতে নিলেই নিজের ভিতরে কেমন জানি মাস্তান-মাস্তান ভাব এসে যায়।“

“তাই নাকি ?“

“হ্যাঁ, হাতে নিয়ে দ্যাখ।“

শ্রাবণী হাতে নিয়ে বলল, “কোথায় ? আমার তো হাতে নিয়ে নিজেকে কীরকম জানি বেকুব-বেকুব লাগছে !“

নিয়াজ বলল, “সেটাই ভালো। আসলে বেকুব-বেকুবই লাগার কথা।“

“আয় জয়ন্তকে সুসংবাদটা দিই - এখন আমাদের হাতে অস্ত্র আছে। মেশিনগান না হলেও বন্দুক তো বটেই !“

জয়ন্ত বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে বারান্দায় গুড়ি মেরে বসেছিল, পায়ের শব্দ শুনে চোখ তুলে তাকিয়ে নিয়াজ আর শ্রাবণীকে বন্দুক হাতে আসতে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "বন্দুক ! কোথায় পেলি ?"

"সোফার কুশনের নিচে লুকানো ছিল।" শ্রাবণী বলল, "বন্দুকটা হাতে নেয়ার পর থেকে নিয়াজ মাস্তান-মাস্তান ব্যবহার করছে !"

জয়ন্ত বাইনোকুলারটা শ্রাবণীর কাছে দিয়ে বন্দুকটা হাতে নিয়ে চাপ দিয়ে সেটা খুলে ব্যারেলের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে বলল, "ময়লা হয়ে আছে - পরিষ্কার করতে হবে।"

শ্রাবণী অবাক হয়ে বলল, "তুই বন্দুক চালাতে পারিস ?"

"আমার এক মামা পাখি শিকার করতেন, তাঁর সাথে মাঝে মাঝে যেতাম।"

"পাখি শিকার !" শ্রাবণী চোখ কপালে তুলে বলল, "ইশ ! কী নিষ্ঠুর।"

"তুই কি চিকেন খাস না ?"

"খাই। কেন ?"

"চিকেন এক ধরনের পাখি। সেটা জ্যান্ত খাওয়া হয় না। মেরে কেটেকুটে খাওয়া হয় - সেটা নিষ্ঠুর না ?"

নিয়াজ বাইনোকুলারটা নিয়ে বেজিগুলোকে দেখার চেষ্টা করছিল। জয়ন্ত বলল, "দেখেছিস? মোস্ট ফেসিনেটিং।"

শ্রাবণী জিজ্ঞেস করল, "কী জিনিজ মোস্ট ফেসিনেটিং ?"

"এই বেজিগুলো। মনে হচ্ছে এদের মাঝে একটা সমাজব্যবস্থা তৈরি হয়েছে।"

"এতে অবাক হবার কী আছে ? প্রায় জন্তুদেরই তো সমাজব্যবস্থা থাকে। জংলী কুকুর, হায়েনা, হাতি -"

"না, না, সেরকম না। এখানে মনে হচ্ছে এদের দায়িত্ব ভাগ করা আছে। কেউ কেউ শ্রমিক - কেউ কেউ -"

"আঁতেল ?"

জয়ন্ত শব্দ করে হেসে বলল, "হ্যাঁ অনেকটা সেরকম। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক আর ডিসকভারি চ্যানেলে সবসময়ে দেখেছি জন্তু-জানোয়ারে সবচেয়ে যেটা বেশি শক্তিশালী সেটাই হচ্ছে নেতা। কিন্তু এখানে মনে হচ্ছে অন্য ব্যাপার।"

“কী ব্যাপার ?“

“কড়ই গাছের নিচে শুকনো হাড়-জিরজিরে একটা বেজি বসে আছে আর অনেকগুলো ধুমসো মোটা মোটা বেজি সেটাকে পাহারা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে কোনো বেজি দেখা করতে আসে - সেটাকে এসকর্ট করে নিয়ে যায়, হাড়-জিরজিরে বুড়ো বেজিটার সামনে গিয়ে মাথা নিচু করে থাকে। আর সবচেয়ে পিকুলিয়ার -“

“কী ?“

“মনে হয় এই বেজিগুলোর একটা ভাষা আছে, নিজেদের মাঝে এরা কথা বলে। মনে হয় হাড়-জিরজিরে বুড়ো বেজিটা হাত নাড়িয়ে কথা বলে, কিছু একটা অর্ডার দেয়। সে-ই নেতা।“

“সত্যি ?“

“হ্যাঁ, দ্যাখ বাইনোকুলারটা দিয়ে।“

শ্রাবণী বাইনোকুলারটা চোখে দিয়ে দূরে তাকায়। কড়ই গাছের নিচে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে একটা শুকনো দুর্বল বেজি বসে আছে। গাছটিকে ঘিরে আরো অনেকগুলো বেজি। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই বোঝা যায়, এই শুকনো হার-জিরজিরে দুর্বল বেজিটি আসলে দুর্বল নয় - অন্য-বেজিগুলো ক্রমাগত তার কাছে আসছে এবং যাচ্ছে, আদেশ নিচ্ছে এবং ছুটে চলে যাচ্ছে। যদি ব্যাপারটি এরকম পরিবেশে না হত শ্রাবণী নিশ্চিতভাবে এর মাঝে খানিকটা কৌতুক খুঁজে পেত - কিন্তু এখন সে কোনো কৌতুক খুঁজে পেল না।

ঠিক দুপুরবেলা বেজিগুলো প্রথমবার তাদের আক্রমন করল। নিয়াজ বাইনোকুলার চোখে দিয়ে বসেছিল। হঠাৎ করে সে চিৎকার করে বলল, “বেজিগুলো কিছু একটা করছে।“

জয়ন্ত ল্যাবরেটরি-ঘরে কিছু কাঠের টুকরায় কাপড় বেঁধে মশাল তৈরি করছিল। সেগুলো টেবিলে রেখে চিৎকার করে জানতে চাইল, “কী করছে ?“

“ছুটোছুটি করছে।“

“কেন ?“

“বুঝতে পারছি না।“

কিন্তু কিছুক্ষণের মাঝেই কারণটা বোঝা গেল। বেজিদের বিশাল বাহিনী থেকে একটা বিরাট অংশ হঠাৎ করে বাসাটির দিকে ছুটে আসতে শুরু করল। এর মাঝে তারা বাসার দরজা জানালা যতটুকু সম্ভব বন্ধ করে দিয়েছিল কিন্তু তবু বেজিগুলোকে নিরুৎসাহিত করা গেল না। পুরানো বাসার ফাঁকফোকর দিয়ে সেগুলো পিলপিল করে ভেতরে ঢুকতে শুরু করে। জয়ন্ত হাতের বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শ্রাবণী আর নিয়াজ বড় বড় লাঠিগুলো নিয়ে অপেক্ষা করে।

“এই ঘরের ভেতরে যদি ঢুকে যায় তাহলে গুলি করব। ঠিক আছে ?“

অন্য দুজন মাথা নাড়ল।

“মশালগুলো রেডি আছে। সলভেন্টে চুবিয়ে শুধু আগুন লাগাতে হবে।“

“ঠিক আছে।“

“সিরিঞ্জগুলোতে এসিড ভরে রেখেছি - খুব কাছে এলে সেটা পুশ করে দেয়া যেতে পারে - কিন্তু সেটা হচ্ছে একেবারে নিরুপায় হলে। লাস্ট রিসোর্ট।“

শ্রাবণী বলল, “আমার মনে হয় সবাই চোখে প্লাস্টিকের গগলসা পরে নিই।“

“হ্যাঁ, যদি কোনোভাবে ঘরে ঢুকে যায় - তাহলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।“

বেজিগুলো বুদ্ধিমান, কাজেই তারা খুব বুদ্ধিমানের মতো কিছু করবে এরকম একটা আশঙ্কা ছিল। কিন্তু দেখা গেল সেরকম বুদ্ধিমানের মতো কিছু করল না। দল বেঁধে বেজিগুলো তাদের কাছাকাছি আসার চেষ্টা করতে লাগল। নিচে দরজা জানালা বন্ধ থাকলেও জানালার ভাঙা কাচ এবং ঘরে ফাঁকফোকর দিয়ে সেগুলো ঢুকতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মাঝেই সিঁড়িতে ধুপধাপ শব্দ শোনা গেল এবং তারপরই ল্যাবরেটরির দরজায় সেগুলো ধাক্কা দিতে শুরু করল। ল্যাবরেটরির দরজাটা ছিটকিনি দিয়ে বন্ধ করে রাখা আছে। কয়েকটা বেজি সেগুলো ধাক্কা দিয়ে খুলতে পারবে না। তবু তারা তিনজন আতঙ্কে শিটিয়ে রইল। শুধু-যে দরজা ধাক্কা দিচ্ছে তা নয়, তারা দেখতে পেল দরজার নব ঘুরিয়ে বেজিগুলো দরজা খোলার চেষ্টা করছে। ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য যে বেজির মতো একটা প্রাণী জানে দরজা খোলার জন্যে নব ঘোরাতে হয়।

কী করবে বুঝতে না পেরে জয়ন্ত দরজার ভেতর থেকে কয়েকটা লাথি মেরে চিৎকার করে বলল, “বদমাইশ বেজির বাচ্চা বেজি। ভাগ এখান থেকে, না হলে খুন করে ফেলব গুলি করে।“

জয়ন্তের কথা শুনে এক মুহূর্তের জন্যে হঠাৎ করে দরজায় ধাক্কা থেমে গেল। মনে হল জয়ন্তের কথা বুঝি বুঝতে পেরেছে। কিন্তু পরমুহূর্তে আবার দরজায় ধাক্কাধাক্কি করতে থাকে। কান পেতে ওরা শুনতে পেল, বেজিগুলো মুখ দিয়ে বিচিত্র নানা ধরনের শব্দ করছে।

নিয়াজ আর শ্রাবণী কি করবে বুঝতে পারছিল না। যদি কোনোভাবে দরজা ভেঙে বেজিগুলো ঢুকে যেতে পারে তাহলে কী হবে তারা চিন্তাও করতে পারে না। এক মুহূর্তে হয়তো তাদের ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলবে।

হঠাৎ ঝনঝন করে কোথায় জানি কাচ ভাঙার শব্দ হল। জয়ন্ত বন্দুক হাতে ল্যাবরেটরির পিছনে ছুটে গিয়ে হতবাক হয়ে যায়। বেজিগুলো আসলেই বুদ্ধিমান - সামনে তাদেরকে ব্যস্ত রেখে সেগুলো পিছন দিয়ে ঢুকে পড়ছে। ল্যাবরেটরির পিছনে পর্দার পিছনে কাচের জানালা ভেঙে বেজিগুলো ঢুকতে শুরু করেছে। জয়ন্ত হতবাক হয়ে দেখল, বেজিগুলো মুখে পাথরের টুকরো ধরে সেগুলি দিয়ে কাচের ওপর আঘাত করে কাচ ভেঙে ফেলছে। কাচের ধারালো ভাঙা টুকরোয় বেজিগুলোর পা কেটে যাচ্ছে। কিন্তু সেগুলো ভ্রুক্ষেপ করল না, লাফিয়ে লাফিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। কিছু বোঝা আগেই জয়ন্ত টের পেল গোটাদশেক বেজি তাকে ঘিরে ফেলেছে। জয়ন্ত পিছনে ঘুরে লাথি দিয়ে কয়েকটা বেজিকে দূরে ছুড়ে দিয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল, সে পিছন থেকে কোনোটাকে আক্রমন করতে দিতে চায় না। কিছু বোঝার আগেই একটা বেজি লাফিয়ে তার শরীর বেয়ে উপরে উঠে তার চোখে কামড় দেয়ার চেষ্টা করল - কিন্তু শক্ত প্লাস্টিকের গগলস থাকায় সেটা প্লাস্টিকের উপর তার ধারালো দাঁতের চিহ্ন রেখে নিচে গড়িয়ে পড়ল। জয়ন্ত হাত দিয়ে বেজিটাকে সরিয়ে দিয়ে বন্দুক দিয়ে গুলি করার চেষ্টা করে কিন্তু বেজিগুলো ক্রমাগত ছুটছে বলে কিছুতেই নিশানা ঠিক করতে পারে না।

জয়ন্তের চিৎকার শুনে নিয়াজ আর শ্রাবণী লাঠি হাতে ছুটে এসে বেজিগুলোকে আঘাত করার চেষ্টা করে। প্রচণ্ড আঘাতে বেজিগুলো ছিটকে পড়ে বিচিত্র শব্দ করতে শুরু করে। জয়ন্ত ঘরের ভেতরে গুলি করার সাহস পায় না বলে বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত করে কয়েকটার মাথা থেঁতলে দিল। বেজিগুলো এক ধরনের জান্তব চিৎকার শব্দ করে তাদের শরীরে বেয়ে উঠার চেষ্টা করে চোখে কামড় দেয়ার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু প্লাস্টিকের গগলস থাকায় তারা প্রতিবারই রক্ষা পেয়ে গেল। ঘরের ভেতরে ভয়ঙ্কর একটা নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেছে। একটার পর একটা বেজি এসে ঢুকছে - কতক্ষণ এদের সাথে টিকে থাকতে পারবে তারা বুঝে উঠতে

পারছিল না। অসম্ভব দ্রুত বেজিগুলো কিছু বোঝার আগে তাদের শরীর বেয়ে উপরে উঠে কামড়ে ধরার চেষ্টা করতে থাকে। জয়ন্ত কোনমতে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে চিৎকার করে বলল, "মশালগুলো নিয়ে আয় -"

শ্রাবণীর শরীরে কয়েকটা বেজি কামড়ে ধরেছে, তার মাঝে সে কোনোভাবে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে ছুটে গিয়ে মশালটা নিয়ে সলভেন্টের ড্রামে ভিজিয়ে নিয়ে ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়ে দিল। সাথে সাথে সেটা দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। দ্বিতীয় মশালটা জ্বালিয়ে সে জয়ন্ত আর নিয়াজের কাছে ছুটে এল, একটা মশাল নিয়াজের হাতে দিয়ে অন্য মশাল নিয়ে এলোপাথাড়ি বেজিগুলোকে মারতে থাকে। সারা ঘরে বেজির লোম পোড়া একটা গন্ধে ভরে গেল। হঠাৎ করে বাইরে থেকে বেজি ঢোকা বন্ধ হয়ে গেল। ভেতরের বেজিগুলোও ঘরের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে পড়ে - আগুন জিনিসটাকে মনে হয় সত্যিই ওরা ভয় পায়।

জয়ন্ত হিংস্র গলায় চিৎকার করে বলল, কোথায় পালিয়েছিস বদমাইশ বেজির দল ? সবগুলোকে খুন করে ফেলব। জবাই করে ফেলব, পুড়িয়ে কয়লা করে দেব -"

নিয়াজ আর শ্রাবণীও বেজিগুলোকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু বড় ল্যাবরেটরির আনাচে-কানাচে কোথাও লুকিয়ে আছে খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এক পলকের জন্যে একটা দেখতে পেলেও সেটা চোখের পলকে অন্য কোথাও সরে যাচ্ছে।

হঠাৎ এক কোণা থেকে একটা বেজি ছুটে এসে অবিকল মানুষের গলায় বলল, "ক্রিঁকি ক্রিঁকি -" এবং এরকম শব্দ করতে করতে সেটি জানালার ফুটো দিয়ে বের হয়ে গেল। সাথে সাথে ঘরের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে থাকা বেজিগুলো ক্রিঁকি ক্রিঁকি শব্দ করতে করতে ছুটে পালিয়ে যেতে শুরু করে। নিয়াজ, শ্রাবণী আর জয়ন্ত প্রচণ্ড আক্রোশে পালিয়ে যেতে থাকা বেজিগুলোকে লাঠি দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করে কয়েকটার মাথা থেঁতলে দিল।

শেষ বেজিটি পালিয়ে যাবার পর তারা ল্যাবরেটরি-ঘরটির চারিদিকে তাকাল। সমস্ত ঘরের লণ্ডভণ্ড অবস্থা। গোটা-ছয়েক বেজি মরে পড়ে আছে। গোটা-দশেক অর্ধমৃত হয়ে এখানে-সেখানে ছটফট করছে। নিজেদের দিকে তাকানো যায় না - চোখগুলো বেঁচে গিয়েছে কিন্তু শরীরের প্রায় পুরোটুকু ক্ষতবিক্ষত। জামাকাপড় ছিঁড়ে গিয়ে রক্তাক্ত হয়ে আছে। শ্রাবণী নিয়াজ এবং জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাকে দেখতে যদি তোদের মতো দেখাচ্ছে তাহলে খবর বেশি ভালো নয়।"

জয়ন্ত বন্দুকটা হেলান দিয়ে রেখে বলল, "তোকে আরো বেশি খারাপ দেখাচ্ছে।"

"কত খারাপ ?"

"ডাইনি বুড়ির মতো।"

"থ্যাংক ইউ জয়ন্ত। তোর মতো আন্তরিক সমবেদনাসম্পূর্ণ মানুষ পাওয়া খুব কঠিন।"

নিয়াজ নিজের হাতপায়ের দিকে লক্ষ্য করে বলল, "আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে এটা ঘটেছে।"

"ঘটেছে না। বল ঘটছে।" শ্রাবণী বলল, "আমি বাজি রেখে বলতে পারি এই বদমাইশগুলি আর দশ মিনিটের মাঝে ফেরত আসছে।"

নিয়াজ কাঁচভাঙা জানালাগুলোর দিকে তাকাল, বলল, "আবার যখন আসবে তখন কী করব ?"

জয়ন্ত দাঁড়িয়ে বলল, "জানালাগুলো কাঠের তক্তা দিয়ে লোহা মেরে বন্ধ করে দিতে হবে।"

"তক্তা কোথায় পাবি ?"

জয়ন্ত লেবরেটরির চেয়ার টেবিল দেখিয়ে বলল, "এগুলো ভেঙে বের করতে হবে।"

নিয়াজ প্রথমে ভাবল জয়ন্ত ঠাট্টা করছে, কিন্তু তার মুখে কৌতুকের কোনো চিহ্ন নেই। নিয়াজ একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "চল তাহলে, দেরি করে লাভ নেই। "

শ্রাবণী ঘরের মৃত এবং অর্ধমৃত বেজিগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, "এগুলো কী করব ?"

"দরজা খুলে বাইরে ফেলে দ্বেদমাইশগুলো দেখলেই গা ঘিনঘিন করছে।"

কিছুক্ষণের মাঝে দেখা গেল সবাই মিলে ঘরটকে আবার সুরক্ষিত করার চেষ্টা করছে। পরের আক্রমনটা কখন হবে কেমন করে হবে সেটা এখনো কেউ জানে না।

॥ ছয় ॥

দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে তিনজন বসে আছে। শরীরের নানা জায়গায় রক্ত শুকিয়ে আছে। কোথাও পানি নেই। তিনজন তিনটি বিকারে খানিকটা এলকোহল নিয়ে একটুকরো কাপড়ে ভিজিয়ে রক্ত মোছার চেষ্টা করছে।

শ্রাবণী বলল, "শুধু শুধু চেষ্টা করছি। বেজির দল আবার এল বুঝি।"

"প্রথম ধাক্কাটা তো সামলে নিয়েছি।"

শ্রাবণী জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে বলল, "পরের ধাক্কাটা হবে আরো শক্ত।"

নিয়াজ একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমরা কি একটার পর একটা ধাক্কা সহ্য করতে থাকব ? আমাদের কী এখান থেকে বের হয়ে যেতে হবে না ?"

"হ্যাঁ। যেতে হবে।"

"সেটা কীভাবে করব ? এই ল্যাবরেটরিতে অল্প কয়টা বেজি আমাদের নাস্তানাবুদ করে ছেড়ে দিয়েছে - বাইরে আমরা কেমন করে যাব ? আমাদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে না ?"

জয়ন্ত কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই শ্রাবণী চিৎকার করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে অন্য দুজন তাকিয়ে দেখে একটা সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। জয়ন্ত ফিসফিস করে বলল, "ভয় পাবি না, কেউ ভয় পাবি না। আমার কাছে বন্দুক আছে, আরেকটু কাছে এলেই গুলি করে দেব।"

জয়ন্ত কথা শেষ করার আগেই দ্বিতীয় সাপটিকে দেখা গেল এবং সেটি পুরোপুরি ঘরের ভেতরে আসার আগেই দরজার নিচে দিয়ে তৃতীয় সাপটির মাথা প্রবেশ করলো।

শ্রাবণী পেছনে সরে গিয়ে একটা টেবিলের ওপরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, "কী হচ্ছে এখানে ? কী হচ্ছে ? এত সাপ কোথা থেকে আসছে ? কোথা থেকে আসছে ?"

শ্রাবণীর কথা শেষ হবার আগেই আরো দুটি সাপের মাথা উঁকি দিল। জয়ন্ত আতঙ্কিত হয়ে দেখল, দরজার নিচে দিয়ে আরো সাপের মাথা কিলবিল করছে। জয়ন্ত হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, হঠাৎ করে সে এত সাপ কোথা থেকে আসছে খানিকটা অনুমান করতে পারে। কিন্তু

এখন সেটা নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই। সে বন্দুকটা তুলে চিৎকার করে বলল, "সরে যা সবাই, পেছনে সরে যা।"

জয়ন্ত বন্দুকটা তুলে বড় কয়েকটা সাপ লক্ষ করে নিশানা করে ট্রিগার টেনে ধরল। গুলি হবে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল না, কিন্তু গুলি হল। বন্ধ ঘরে সেই বিকট শব্দে সবার কানে তালা লেগে যায়। ধোঁয়া সরে গেলে দেখতে পেল সাপগুলো গুলিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। কয়েকটা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তারা অনেকগুলো বেজির চিৎকার শুনতে পেল - সেগুলো দুদ্দার করে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে।

নিয়াজ হাতের লাঠি দিয়ে সাপগুলোকে মারার চেষ্ট করে। কয়েকটার শিরদাঁড়া ভেঙে দিল। কয়েকটা ল্যাবরেটরির কোনায় লুকিয়ে গেল। প্রাথমিক উত্তেজনাটুকু কেটে যাবার পর শ্রাবণী কাঁদো-গলায় বলল, "দেখলি ? দেখলি বেজিগুলো কী করছে ?"

"সাপ ধরে এনে ছেড়ে দিচ্ছে।"

"কত বড় বদমাইশ দেখেছিস ?"

নিয়াজ হাতের লাঠিটা হাতে নিয়ে সতর্ক-চোখে ঘরের চারপাশে তাকাতে তাকাতে বলল, "তুই এমনভাবে কথা বলছিস যেন ওগুলো বেজি না - মানুষ।"

"হ্যাঁ।" শ্রাবণী মাথা নেড়ে বলল, "ফিচলে বুদ্ধি দেখেছিস ?"

জয়ন্ত বলল, "পড়িস নি - অহি-নকুল সম্পর্ক। এই হচ্ছে সেই অহি-নকুল। নকুল অহিকে ধরে এনে এখানে ছেড়ে দিচ্ছে।"

"এরপরে কী করবে ?"

"ভাগ্যিস এখনো আগুন জ্বালানো শিখেনি - যদি জানত তাহলে আমি হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর বাসায় আগুন লাগিয়ে দিত।"

নিয়াজ একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আঁতেলদের মতো শুধু কথা বলিস না - কী করা যায় ভেবে ঠিক কর।"

জয়ন্ত রেগে গিয়ে বলল, "আমি আঁতেলদের মতো শুধু কথা বলছি ?"

"বলছিসই তো। সেই তখন থেকে ভ্যাদর ভ্যাদর করছিস।"

শ্রাবণী বিরক্ত হয়ে বলল, "এটা ঝগড়া করার সময় ? চুপ করবি তোরা ?"

দুজনে চুপ করে কঠিন মুখে শ্রাবণীর দিকে তাকাল। শ্রাবণী বলল, “আগে এই ঘরটা মোটামুটি সিকিওর ছিল, এখন এর ভেতরে সাপ ছেড়ে দিয়েছে। ভেতরে কয়টা সাপ লুকিয়ে আছে কে জানে। এখানে থাকা যাবে না।“

“এখন পর্যন্ত দেখা গেছে বেজিগুলো আগুনকে ভয় পায়। আগুনটাই আমাদের ভরসা।“

জয়ন্ত নিয়াজের দিকে তাকিয়ে বলল, “কী করবি আগুন দিয়ে ?“

“ধর, অনেকগুলো মশাল তৈরি করে - সেগুলো হাতে নিয়ে যদি হেঁটে যাই ? বিচে গিয়ে জব্বার মিয়ার ট্রলারের জন্যে অপেক্ষা করি ?“

জয়ন্ত খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণচোখে নিয়াজের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, “ইট মে ওয়ার্ক। ঠিকই বলেছিস। তবে একটা ডেঞ্জার আছে।“

“কী ডেঞ্জার ?“

“যদি আমাদের আক্রমন করে বসে আমাদের কিছু করার নেই।“

“বন্দুকটা আছে।“

“হ্যাঁ, বন্দুকটা দিয়ে কিছু গুলি করতে পারি - কয়েকটা মারতে পারি - কিন্তু তাতে লাভ কী?“

শ্রাবণী অস্থির হয়ে বলল, “কিন্তু কিছু-একটা তো করতে হবে - আমরা তো এভাবে বসে থাকতে পারব না ?“

জয়ন্ত একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, “বেঁচে থাকার জন্যে দরকার হলে এভাবে বসেই থাকতে হবে। এখনো জব্বার মিয়া আছে - জব্বার মিয়া হচ্ছে আমাদের বাইরের পৃথিবীর সাথে কানেকশন। সে যখন এসে দেখবে আমরা বিচে নাই - তখন নিশ্চয়ই কিছু-একটা করবে। দরকার হলে আমাদের এখানে সাপের সাথে বেজির সাথে বসে থাকতে হবে।“

বেজিদের দ্বিতীয় আক্রমণটা হলো আরো পরিকল্পিত। বাসার ছাদে ধুপধাপ শুনে তারা বারান্দায় এসে দেখে, পাশের একটা বড় কড়ই গাছের ওপরে বেজিগুলো একটা গাছের লতা বেঁধেছে। সেই লতাটি ধরে ঝুল খেয়ে ছাদের ওপর বেজিগুলো লাফিয়ে এসে নামছে। দৃশ্যটি নিজের চোখে না দেখলে তারা বিশ্বাস করত না। বেজির মতো একটা প্রাণী যে গাছের ডালে

একটা লতা বাঁধতে পারে সেটাই বিশ্বাস হতে চায় না। দড়ির মতো চমৎকার এরকম একটা লতা কোথায় পেয়েছে সেটাও একটা রহস্য। নিয়াজ বাইনোকুলার দিয়ে দেখে বলল, “লতাটি বেণির মতো বুনে নেওয়া হয়েছে।“

তিনজন খানিকক্ষণ বেজিদের এই অবিশ্বাস্য কার্যক্রম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। শেষ পর্যন্ত জয়ন্ত বলল, “এগুলোকে থামাতে হবে।“

নিয়াজ জিজ্ঞেস করল, “কীভাবে থামাব ?“

“গুলি করে।“

বন্দুকে গুলি ভরতে গিয়ে জয়ন্ত থেমে গিয়ে বন্দুকটা নিয়াজের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, “নে এবারে তুই গুলি কর।“

“আমি আগে কখনো গুলি করিনি।“

“সেইজন্যেই দিচ্ছি। এইম করে ট্রিগার টেনে ধরবি।“

“নিশানা যদি না হয় ?“

“না-হওয়ার কী আছে ? ছররা গুলি - নিশানার দরকারও নেই।“

নিয়াজ গাছের লতা বেঁধে ঝুলে আসা একটা বেজিকে গুলি করতেই বেজিগুলো কর্কশ স্বরে চিৎকার করতে শুরু করল। তারা অবাক হয়ে লক্ষ করল, বেজিগুলো অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, চোখের পলকে সেগুলো কোথাও লুকিয়ে গেল। দেখে মনে হল কোথাও কিছু নেই। মিনিট দশেক পর ধীরে ধীরে বেজিগুলো বের হয়ে আসে, তারপর আবার লতাটি টেনে টেনে একটা বেজি গাছের উপর উঠতে থাকে। তাদের ধৈর্যের কোনো অভাব নেই এবং কিছুক্ষণের মাঝে আবার লতায় ঝুল খেয়ে বাসার ছাদে লাফিয়ে পড়তে শুরু করে। দেখে মনে হয় বেজিগুলো বুঝে গিয়েছে তাদের কাছে গুলি বেশি নেই। এভাবে খুব বেশিবার তাদেরকে উৎপাত করা হবে না।

বাসার ছাদে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা উপস্থিত হওয়ার পর সেগুলো নিশ্চয়ই কার্নিশ বেয়ে ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। একসাথে কতগুলো আসবে এবং কীভাবে আক্রমন করবে তারা এখনো জানে না। বসে বসে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। ছাদে বেজিদের ধুপধাপ শব্দ ছাড়া আর কোথাও কোনো শব্দ নেই। চারপাশে একধরনের ভয়-ধরানো আতঙ্ক। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এসছে - কিছুক্ষণ পর অন্ধকার হয়ে আসবে - তখন কী হবে কে জানে !“

ঠিক এরকম সময়ে তারা অনেক দূর থেকে একটা ট্রলারের শব্দ শুনতে পেল। শ্রাবণী বলল, "জব্বার মিয়া ট্রলার নিয়ে এসেছে।"

অন্য দুজন কোনো কথা বলল না। এই ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের জগৎ থেকে পালিয়ে যাবার একটা অদম্য ইচ্ছা কাজ করছে কিন্তু কিছু করতে পারছে না। হঠাৎ করে তাদের ভেতরে একধরনের অস্থির হতাশা এসে ভর করে। নিয়াজ প্রায় বেপরোয়া হয়ে বলল, "চল মশাল জ্বালিয়ে বের হয়ে যাই।"

গত কয়েক ঘন্টার ঘটনায় তাদের ভেতরে এরকম ভয়ঙ্কর একটা চাপ পড়েছে যে, সেটা সহ্য করা কঠিন হয়ে যাচ্ছিল।

তারা আরো একটু হলে নিয়াজের কথায় হয়তো সত্যি সত্যি বের হয়ে পড়তো। কিন্তু ঠিক তখন হঠাৎ করে ঝুপঝাপ করে চারিদিকে থেকে বেজিগুলো লাফিয়ে পড়তে শুরু করল। জয়ন্ত চিৎকার করে বলল, "ল্যাবরেটরি ঘরে -"

কিন্তু জয়ন্তর কথা শেষ হবার আগেই প্রায় বিশ থেকে ত্রিশটি বেজি তার ওপর একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রচণ্ড ধাক্কা সহ্য করতে না-পেরে সে হুমড়ি খেয়ে নিচে পড়ে যায়। জয়ন্ত ছটফট করতে থাকে এবং তার সারা শরীরে বেজিগুলো কিলবিল করতে থাকে। নিয়াজ আর শ্রাবণী পাগলের মতো লাঠি দিয়ে মারার চেষ্টা করে কিন্তু সেগুলো ভ্রুক্ষেপ করে না। নিয়াজ এগিয়ে আসা কিছু বেজিকে লক্ষ্য করে গুলি করে ভয় দেখানো চেষ্টা করল কিন্তু একই জায়গায় কাছাকাছি জয়ন্ত এবং শ্রাবণী - সে গুলি করতে পারল না। বন্দুকের কুঁদো দিয়ে বেজিগুলোর মাথা আর শরীর থেঁতলে দেয়ার চেষ্টা করতে লাগল।

শ্রাবণী ছুটে ল্যাবরেটরি ঘরে গিয়ে দুটো মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে বাইরে ছুটে আসে। জয়ন্তকে বাঁচানোর জন্যে মশাল দিয়ে তার শরীরের ওপরেই বেজিগুলোকে এলাপাথাড়ি আঘাত করতে থাকে। এইভাবে তারা কতক্ষণ যুদ্ধ করেছে জানে না - কিন্তু শেষপর্যন্ত বেজিগুলো কর্কশ শব্দ করতে করতে জয়ন্তকে ছেড়ে সরে যায়। জয়ন্ত টলতে টলতে কোনোভাবে উঠে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড আক্রোশে একটা লাঠি তুলে নিয়ে বেজিগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। লাঠির প্রচণ্ড আঘাতে বেজিগুলোর মাথা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, শিরদাঁড়া ভেঙে সেগুলো ছটফট করতে থাকে। নিয়াজ আর শ্রাবণীর জ্বলন্ত মশালের আগুনের ঝাপটায় শেষপর্যন্ত শেষ বেজিটিও পালিয়ে যাবার পর জয়ন্ত দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে জোরে জোরে নিশ্বাস নিয়ে বলল, "মোস্ট পিকুলিয়ার।"

শ্রাবণী আর নিয়াজ জয়ন্তের কাছে গিয়ে তাকে পরীক্ষা করে। শরীরের নানা জায়গায় কেটে গেছে। আগুনের হলকায় বুক পেট হাতের কনুই ঝলসে গেছে। সারা শরীরে কালিঝুলি মেখে তাকে কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছে। জয়ন্ত নিয়াজ আর শ্রাবণীর দিকে তাকিয়ে বলল, "বেজিগুলো এবার শুধু আমাকে আক্রমণ করল কেন ? আমি কী করেছি ?"

শ্রাবণী চিন্তিতভাবে বলল, "হ্যাঁ। আমিও বুঝতে পারছি না। মনে হল একেবারে চিন্তা-ভাবনা পরিকল্পনা করে তোকে ধরেছে।"

জয়ন্ত কাঁপা গলায় বলল, "একসাথে এতগুলো আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যে ইচ্ছে করলে আমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারত। কিন্তু মনে হল ওদের অন্য একটা উদ্দেশ্য ছিল -"

"কী উদ্দেশ্য ?"

"কিছু বুঝতে পারছি না। মনে হয়েছে সারা শরীর তন্নতন্ন করে খুঁজেছে কিছু-একটার জন্যে -"

নিয়াজ হঠাৎ চিৎকার করে বলল, "এই দ্যাখ।"

শ্রাবণী ছুটে গেল, জয়ন্ত পিছু পিছু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে গেল। টেবিলের নিচে একটা বেজি মরে পড়ে আছে। সম্ভবত লাঠির আঘাতে মাথাটা পুরোপুরি থেঁতলে গেছে। তবে বেজিটা এখনো শক্ত করে একটা ম্যাচের বাক্স ধরে রেখেছে। নিয়াজ অবাক হয়ে বলল, "এটা কোথায় পেয়েছে ?"

জয়ন্ত নিজের পকেটে হাত দিয়ে বলল, "আমার ম্যাচ। আমার পকেট থেকে নিয়েছে।"

তিনজনই একজন আরেকজনের দিকে অবাক হয়ে তাকাল। জয়ন্ত ফিসফিস করে বলল, "বুঝতে পেরেছিস আমাকে কেন ধরেছে ?"

"হ্যাঁ।"

"আমাকে নিশ্চয়ই ম্যাচ দিয়ে সিগারেট ধরাতে দেখেছে - তাই এখন ম্যাচটা চায়। আগুন ধরানো শিখতে চায়।"

নিয়াজ নিচু হয়ে মৃত বেজিটার সামনের দুই পা দিয়ে শক্ত করে ধরে রাখা ম্যাচটি হাতে নিয়ে বলল, "তাহলে কী আমরা বেজিদের সাথে একটা সন্ধি করতে পারি ? আমরা ওদের এই ম্যাচটা দেব - তারা আমাদের চলে যেতে দেবে !"

শ্রাবণী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ঠিক তখন মনে হল খুব কাছে থেকে ট্রলারের শব্দটা শোনা যাচ্ছে। তারা প্রায় ছুটে বের হয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়াল - সেখান থেকে সমুদের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। জব্বার মিয়া তার ট্রলারটা নিয়ে আসছে। শ্রাবণী অবাক হয়ে বলল, “কী আশ্চর্য ! জব্বার মিয়া এখানে চলে এল কেমন করে ? সে কেমন করে জানে আমরা এখানে ?“

“নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই -“ নিয়াজ ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে সুবিধে করতে পারল না।

নিশ্চয়ই কী ?“

জয়ন্ত বলল, “গুলির শব্দ শুনে অনুমান করেছে আমরা নিশ্চয়ই মাজেদ খানের বাসার আছি?“

“হ্যাঁ। তাই হবে !“

তিনজন বারান্দায় দাঁড়িয়ে জব্বার মিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু কয়েকটা গাছের আড়ালে থাকার কারণে তারা মোটামুটি বেশ স্পষ্ট জব্বার মিয়াকে দেখতে পেলেও জব্বার মিয়া তাদের দেখতে পাচ্ছে না। নিয়াজ বলল, “এই সুযোগ। আমাদের এখন অল্প কিছুদূর যেতে হবে ! মাত্র এইটুকু।“

“কিন্তু মাত্র এইটুকু যেতে কতগুলো বেজি পার হয়ে যেতে হবে দেখেছিস ?“

“হ্যাঁ।“ শ্রাবণী মাথা নাড়ল, “ঠিকই বলেছিস।“

“কিন্তু কিছু তো করার নেই। আয় মশালে আগুন জ্বালিয়ে বের হয়ে যাই।“ নিয়াজের কথা শুনে সবাই বাইরে তাকাল। কয়েক হাজার বেজি নিশ্চল হয়ে বসে আছে দেখে আবার তারা সাহস হারিয়ে ফেলল। এই দুঃস্বপ্নের জগৎ থেকে পালিয়ে যাবার সুযোগ এত কাছে চলে এসেছে তবুও যেতে পারছে না বলে তারা একধরনের হতাশায় ছটফট করতে থাকে।

তারা দেখতে পেল জব্বার মিয়া ট্রলারটাকে খানিকটা টেনে তীরে তুলল যেন ঢেউয়ে ভেসে না যায়। তারপর রোদ থেকে চোখ আড়াল করে এদিক-সেদিক তাকাল। কিছু দেখতে না-পেয়ে চিন্তিত-মুখে নৌকার পাটাতন তুলে তার হাতে বানানো পাইপগানটা তুলে হেঁটে আসতে শুরু করল। হাঁটার ভঙ্গি দেখে বোঝা গেল জব্বার মিয়া এই জায়গাটা মোটামুটি চেনে। সে এখন মাজেদ খানের বাসার দিকেই আসছে।

জয়ন্ত অন্য দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল, “সর্বনাশ, এখন দেখি জব্বার মিয়া এদিকে আসছে। একেবারে সোজাসুজি বেজিদের মুখে পড়বে।“

"হ্যাঁ। ওকে আসতে নিষেধ কর।" শ্রাবণী ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "চিৎকার করে নিষেধ করে দে।"

নিয়াজ চিৎকার করে জব্বার মিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল। সেই চিৎকার শুনে বেজিগুলো সচকিত হয়ে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল কিন্তু জব্বার মিয়া কিছু শুনতে পেল না। দ্বীপটার ঠিক এই জায়গা দিয়ে সমুদ্রের হাওয়া শনশন করে বইছে। গাছের পাতার শব্দ, সমুদ্রের গর্জন, সব মিলিয়ে কিছু শোনার কথা নয়। তিনজন একধরনের আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে রইল এবং দেখতে পেল জব্বার মিয়া আলগোছে তার পাইপগানটা ধরে ধীরে ধীরে ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে পা দিতে আসছে।

শ্রাবণী ফ্যাকাশে মুখে বলল, "সর্বনাশ ! কী হরে এখন ! জব্বার মিয়া যে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না -"

তিনজনে মিলে আবার চিৎকার করল। মনে হল জব্বার মিয়া কিছু-একটা শুনতে পেল। কিন্তু সেটা শুনে সে থেমে না গিয়ে আরো বেশি উৎসাহ নিয়ে ওপরে ছুটে আসতে শুরু করল।

জয়ন্ত বলল, "জব্বার মিয়াকে থামাতে হবে। এক্ষুণি থামাতে হবে।"

"কীভাবে থামাবি ?"

"বন্দুকটা দে - একটা গুলি করি। গুলির শব্দ শুনলে থেমে যাবে।"

ব্যাপারটা পুরোপুরি চিন্তা না করেই জয়ন্ত বন্দুকটা হাতে নিয়ে একটা ফাঁকা আওয়াজ করল এবং সাথে সাথে জব্বার মিয়া চমকে উঠে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে গেল। গুলির প্রচণ্ড শব্দে বেজিগুলো এক মুহূর্তের জন্যে নিচু হয়ে যায় এবং পরমুর্হূর্তে মাথা তুলে তাকিয়ে জব্বার মিয়াকে দেখতে পেয়ে তাকে আক্রমণ করার জন্যে ছুটে যেতে থাকে।

এতদূর থেকেও তারা জব্বার মিয়ার মুখে ভয়ঙ্কর আতঙ্কের চিহ্ন দেখতে পেল, সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কয়েক মুহূর্ত সে ছুটে-আসা বেজিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর মাজেদ খানের বাসার দিকে ছুটতে শুরু করল। জয়ন্ত, শ্রাবণী এবং নিয়াজ একটি ভয়ের ছবির দৃশ্যের মতো দেখতে পেল একজন মানুষ তার প্রাণ নিয়ে ছুটছে এবং তার পেছন থেকে ঢেউয়ের মতো ধূসর মৃত্যু এগিয়ে আসছে। জব্বার মিয়া ছুটছে এবং তার মাঝে কয়েকটা বেজি লাফিয়ে তার শরীরের নানা জায়গায় কামড় দিয়ে ঝুলে পড়ল। জব্বার মিয়া হাত দিয়ে সেগুলো ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে কিন্তু কোনো লাভ হয় না। শেষপর্যন্ত হাতের পাইপগানটা

লাঠির মতো ব্যবহার করে প্রচণ্ড আঘাতে সে কিছু বেজিকে ছিটকে ফেলে দিল। ছুটতে ছুটতে সে একটা গুলি করে বেশকিছু বেজিকে রক্তাক্ত করে দিল কিন্তু তবু বেজিগুলো থামল না। মাজেদ খানের বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে জয়ন্ত নিয়াজ আর শ্রাবণী দেখতে পেল ছুটতে ছুটতে জব্বার মিয়া বাসার খুব কাছে চলে এসেছে কিন্তু কবু শেষ রক্ষা করতে পারবে বলে মনে হয় না। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো অসংখ্য বেজি পেছন থেকে একসাথে জব্বার মিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাল সামলাতে না পেরে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। পরমুহূর্তে দেখা গেল জব্বার মিয়া একটা ধূসর আবরণে ঢেকে গেছে, তার ওপর অসংখ্য বেজি কিলবিল করছে, চোখের পলকে নিশ্চয়ই তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে।

শ্রবণী চিৎকার করে নিজের মুখ ঢেকে ফেলল। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটি দেখার মতো সাহস তার নেই।

জয়ন্ত কয়েক মুহূর্ত নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরে পায়। সে চিৎকার করে বলল, “জব্বার মিয়াকে বাঁচাতে হবে !“

“কীভাবে ?“

“জানি না।“জয়ন্ত বন্দুকে গুলি ভরে নিচে ছুটতে ছুটতে বলল, “তোরা মশালে আগুন জ্বালিয়ে আন, তাড়াতাড়ি।“

জয়ন্ত চিৎকার করতে করতে ছুটে গেল। জব্বার মিয়া ছটফট করছে, তার ওপরে ঢেউয়ের মতো বেজিগুলো দৌড়াদৌড়ি করছে - তাদের হিংস্র আস্ফালনের মাঝেও জয়ন্ত জব্বার মিয়ার চিৎকার শুনতে পেল। জয়ন্ত জব্বার মিয়াকে বাঁচিয়ে তার কাছাকাছি বেজিগুলোকে লক্ষ করে গুলি করল। গুলির আঘাতে অসংখ্য বেজি ছিটকে পড়ে যায় - মুহূর্তের জন্যে সেগুলো থমকে দাঁড়ায়, বেশকিছু ছুটে পালিয়ে যেতে চেষ্ট করে। জয়ন্ত সেই অবস্থায় চিৎকার করে জব্বার মিয়ার কাছাকাছি ছুটে যেতে যেতে দ্বিতীয়বার গুলি করল। বেজিগুলো এবারে লাফিয়ে খানিকটা দূরে সরে গেল, কিন্তু একেবারে চলে গেল না। তারা কুতকুতে হিংস্র চোখে জব্বার মিয়া এবং জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে রইল।

ততক্ষণে শ্রাবণী আর নিয়াজও ছুটে আসছে। তাদের দুই হাতে চারটি জ্বলন্ত মশাল। সেখানে দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন। আগুন দেখে বেজিগুলো আরো কয়েক পা পিছিয়ে যায়। জয়ন্ত ছুটে গিয়ে এবার জব্বার মিয়াকে টেনে তোলার চেষ্টা করল। সারা শরীর রক্তাক্ত। মনে

হয় বেজিগুলো খুবলে তার শরীর থেকে মাংস তুলে নিয়েছে। জব্বার মিয়া চোখ খুলে তাকাল। তার চোখে আতঙ্ক এবং অবিশ্বাস।

নিয়াজ এবং শ্রাবণী মশালগুলো নাড়তে নাড়তে আগুনের শিখা দিয়ে বেজিগুলোকে ভয় দেখাতে দেখাতে এগিয়ে আসতে থাকে। বেজিগুলো নিরাপদ দূরত্বে থেকে একধরনের চাপা গর্জন করতে থাকে। শ্রাবণী এবং জয়ন্ত মিলে জব্বার মিয়াকে টেনে সোজা করে দাঁড় করাল। নিয়াজ মাটি থেকে তার পাইপগানটা তুলে নেয়। এটা দিয়ে কীভাবে গুলি করতে হয় সেটা সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই, তবু সেটি বেজিদের দিকে তাক করে রাখল।

শ্রাবণী চোখের কোণা দিয়ে বেজিগুলোকে লক্ষ করে, সেগুলো আক্রমণের ভঙ্গিতে তাদের লেজ নাড়ছে। যে-কোনো মুহূর্তে আবার তাদের আক্রমণ করে বসতে পারে। জব্বার মিয়াকে দুই পাশ থেকে ধরে জয়ন্ত আর শ্রাবণী মাজেদ খানের বাসার দিকে নিতে থাকে, তাদের ঠিক পেছনে পেছনে নিয়াজ মশালটি নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসে।

বাসার সিঁড়ির কাছাকাছি পৌঁছে যাবার পর হঠাৎ করে বেজিগুলো আক্রমণ করল। তাদের নিজস্ব কোনো সংকেত আছে - সেটি পাওয়ামাত্রই চলন্ত ট্রেনের মতো ছুটে এসে কয়েকশ বেজি তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার প্রচণ্ড ধাক্কায় তারা সিঁড়ির ওপরে আছড়ে পড়ল। হাত থেকে মশাল ছিটকে পড়ে এবং হঠাৎ করে শ্রাবণী বুঝতে পারল তাদেরকে বেজিগুলো এখন শেষ করে ফেলবে। ঘাড়ের কাছে কোথায় জানি কয়েকটা বেজি কামড়ে ধরেছে। সেগুলো ছোটানোর জন্যে সে প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে - কিন্তু একটাকে সরানোর আগেই আরো দশটি এসে জাপটে ধরছে। আগুনের মশালের ওপরে কেউ গড়াগড়ি খাচ্ছে, মাংস এবং লোম পোড়ার বিভৎস একটা উৎকট গন্ধ নাকে এসে লাগে। যন্ত্রণায় কেউ একজন চিৎকার করছে - গলার স্বরটি কার শ্রাবণী বুঝতে পারল না। মৃত্যু তাহলে এরকম - এই ধরনের একটা কথা মনে হল তার, ব্যাপারটি ভয়ঙ্কর, ব্যাপারটি বীভৎস। তার মাথায় একটা বেজি কামড়ে ধরে শক্ত চোয়ালের আঘাতে ছিড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। পায়ে কয়েকটা কামড়ে ধরে মাংস ছিঁড়ে নিতে চাইছে। ভয়ঙ্কর যন্ত্রনায় শ্রাবণী আর্তনাদ করে উঠল। মৃত্যু যদি আসবেই সেটি তাহলে আরো তাড়াতাড়ি কেন আসছে না ?

শ্রাবণী প্রচণ্ড যন্ত্রণায় অচেতন হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তার ভেতরেও কে জানি তাকে বলল, চেষ্টা কর - বেঁচে থাকার চেষ্টা কর। সে তাই শেষবার চেষ্টা করল, চিৎকার করে বলল, "ক্রিঁকি ক্রিঁকি ক্রিঁকি -"

হঠাৎ করে জাদুমন্ত্রের মতো বেজিগুলো থেমে গেল। একটি আরেকটির দিকে তাকাল। মনে হচ্ছে কিছু-একটা বুঝতে পারছে না। শ্রাবণী আবার বলল, "ক্রিঁকি ক্রিঁকি ক্রিঁকি -"

সাথে সাথে বেজিগুলো লাফিয়ে তাদের শরীর থেকে নমে গিয়ে অবিকল মানুষের গলায় "ক্রিঁকি ক্রিঁকি" বলতে বলতে ছুটে পালিয়ে যেতে শুরু করে।

বেজিগুলো সরে যেতেই শ্রাবণী মাথা তুলে তাকাল। অন্য তিনজন সিঁড়ির ওপরে এবং নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাদেরকে দেখে মানুষ বলে চেনা যায় না। দেখে মনে হয় রক্তাক্ত কিছু মাংসপিণ্ড। শ্রাবণী কোনোমতে উঠে দাঁড়িয়ে ভয়-পাওয়া গলায় ডাকল, "নিয়াজ, জয়ন্ত।"

কোনোমতে নিয়াজ আর জয়ন্ত উঠে বসে। তারা বিস্ফারিত চোখে শ্রাবণীর দিকে তাকিয়ে থাকে - বেজিগুলো যে তাদের টুকরো-টুকরো না করেই চলে গেছে এখনো সেটা তাদের বিশ্বাস হচ্ছে না।"

শ্রাবণী টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "তোরা উঠতে পারবি ?"

"মনে হয় পারব।" নিয়াজ বন্দুকটার ওপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। শ্রাবণী গিয়ে জয়ন্তের হাত ধরে তুলল। জয়ন্ত আর নিয়াজ মিলে চেষ্টা করে জব্বার মিয়াকে টেনে তুলল। তারপর ছোট দলটা কোনোভাবে নিজেদেরকে টেনে হিঁচড়ে নিতে থাকে।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল, "শ্রাবণী, তুই কেমন করে জানলি যে ক্রিঁকি ক্রিঁকি বললে বেজিগুলো আমাদের ছেড়ে দেবে ?"

"যদি জানতাম তাহলে আরো আগেই বলতাম। জানতাম না বলেই তো এই অবস্থা।"

"কী বলছিস তুই - আমরা জানে বেঁচে গিয়েছি জানিস ?"

"আমি এত নিশ্চিত নই। একবার বেঁচে গিয়েছি মানে এই নয় যে বার বার বেঁচে যাব। তবে এইভাবে মরব কখনো ভাবিনি।"

"এখনো তো মরিনি -"

শ্রাবণী কোনো কথা বলল না। জয়ন্ত আবার জিজ্ঞেস করল, "তুই কেমন করে বুঝতে পারলি ক্রিঁকি ক্রিঁকি বললে ওগুলো চলে যাবে ?"

"মনে নেই ল্যাবরেটরিতে প্রথম যখন এসেছিল - পালিয়ে যাবার সময় একটা বেজি বলল ক্রিঁকি ক্রিঁকি। তখন সবগুলো মিলে পালিয়ে গেল।"

"হ্যাঁ। মনে আছে।"

"আমার মনে হল হয়তো ক্রিঁকি ক্রিঁকি মানে, বিপদ বিপদ পালাও। সেটা শুনে হয়তো সবগুলো পালাবে।"

নিয়াজ এই অবস্থায় হাসার চেষ্টা করে বলল, "তুই বেজিদের একটা মাত্র শব্দ শিখেছিস - সেটা দিয়েই চারজন মানুষের জান বাঁচিয়ে দিয়েছিস। কী আশ্চর্য !"

শ্রাবণী কোনো কথা বলল না। সে কোনোকিছু চিন্তা করতে পারছিল না, যদি পারত তাহলে বুঝতে পারত ব্যাপারটি সত্যিই খুব আশ্চর্য।

ল্যাবরেটরি-ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে চারজন মেঝের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। তাদের শরীর থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ে মেঝের বড় অংশ রক্তাক্ত হয়ে যেতে থাকে।

॥ সাত ॥

শ্রাবণী চোখ খুলে দেখল জয়ন্ত জব্বার মিয়ার হাত ধরে পাসল পরীক্ষা করছে। শ্রাবণী কোনোভাবে উঠে বসল। শরীরের নানা জায়গা ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে। একটু নড়লেই প্রচণ্ড ব্যথায় শরীর অবশ হয়ে আসতে চায়, সেই অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়ে জয়ন্তর কাছে যেতে যেতে বলল, “কী হয়েছে ?“

“অবস্থা খুব ভালো না। তবে রক্তটা বন্ধ করা দরকার।“

“তবু ভালো।“

“হ্যাঁ। কিন্তু এখনই হাসপাতালে নেওয়া দরকার।“

শ্রাবণী বিচিত্র দৃষ্টিতে জয়ন্তের দিকে তাকাল। সে এখনো একজনকে হাসপাতালে নেয়ার কথা ভাবছে ব্যাপারটি তার বিশ্বাস হতে চায় না। জয়ন্ত এলকোহলে ভরা একটা বিকার শ্রাবণীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, “নে, তোর শরীরের রক্ত মুছে নে। দেখতে খুব খারাপ লাগছে।“

শ্রাবণী আবার জয়ন্তর দিকে তাকাল। দেখতে খারাপ লাগা না-লাগার ব্যাপারটি নিয়ে এখনো কেউ মাথা ঘামাতে পারে সেটিও তার বিশ্বাস হয় না।

জয়ন্ত নরম গলায় বলল, “আয় কাছে আয়, তোর মুখটা মুছে দিই।“

শ্রাবণী কিছু বলার আগেই জয়ন্ত একটা কাপড়ের টুকরো এলকোহলে ভিজিয়ে শ্রাবণীর কপাল এবং গালে শুকিয়ে থাকা রক্ত মুছে দিতে দিতে বলল, “তোকে সব সময় দেখেছি সেজেগুজে সুন্দর হয়ে থাকা একজন মানুষ। তাই তোকে এভাবে দেখলে আমরা ইনসিকিওর ফিল করি।“

ক্ষতস্থানগুলোতে এলকোহলের স্পর্শ লাগামাত্র জায়গাগুলো তীব্রভাবে জ্বালা করে ওঠে। শ্রাবণী দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল। জয়ন্ত নিচুগলায় বলল, “সবচেয়ে সমস্যাটা হয়েছে কি জানিস ?“

“কী ?“

“পানি।“

“হ্যাঁ, তৃষ্ণায় বুকটা একেবারে ফেটে যাচ্ছে।“

“এত ব্লিডিং হয়েছে, যে আর পারছি না। এভাবে আর বেশিক্ষণ থাকা যাবে না।“

এরকম সময় জব্বার মিয়া চোখ খুলে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, “ট্রলারে আপনাদের জন্যে পানি নিয়ে এসেছি।“

জয়ন্ত জব্বার মিয়ার উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, “আপনার এখন কেমন লাগছে ?“

“দুর্বল লাগছে।“ জব্বার মিয়া একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, “আমাকে নিয়ে চিন্তা করবেন না।“

“কেন চিন্তা করব না ?“

“আমাদের হচ্ছে বিড়ালের জান। আমরা এত সহজে মরি না। আল্লাহ হায়াত দিলে বেজির বাচ্চা বেজি কিছু করতে পারবে না।“

শ্রাবণী জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে বলল, “এই হচ্ছে খাঁটি স্পিরিট।“

জব্বার মিয়া আস্তে আস্তে বলল, “তবে আপনারা যদি তখন না আসতেন তাহলে কেউ আমারে বাঁচাতে পারত না। আজরাইল জানটা কবচ করে নিয়েই ফেলেছিল !“

জয়ন্ত কাঁধ স্পর্শ করে বলল, “ঠিক আছে। এখন আর বেশি কথা বলবেন না। শক্তিটা বাঁচিয়ে রাখেন।“

শ্রাবণী হামাগুড়ি দিয়ে নিয়াজের কাছে গিয়ে বলল, “নিয়াজ তোর কী অবস্থা ?“

নিয়াজ চোখ খুলে তাকিয়ে বলল, “বেশি ভালো না।“

“ভালো না হলে হবে কেমন করে ? উঠে বস।“

নিয়াজ খুব কষ্ট করে উঠে বসল, একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, “যা পানির তৃষ্ণা পেয়েছে কী বলব !“

শ্রাবণী হাসার চেষ্টা করে বলল, “এই ট্রলারেই পানি আছে, চিন্তা করিস না !“

“সত্যি ?“

“হ্যাঁ।“

“আমি আর পারছি না। এখানে থেকে পানি তৃষ্ণায় মরার থেকে বাইরে বেজির কামড় খেয়ে মরা অনেক ভালো।“

“ঠিকই বলেছিস।“

জয়ন্ত কষ্ট করে উঠে দাঁড়িয়ে আরো একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে বলল, “এতক্ষণে বাইরে অন্ধকার হয়ে গেছে। আমাদের ফেরত যাওয়ার কাজটা আরো কঠিন হয়ে গেল।“

“যত সময় যাচ্ছে তত দুর্বল হয়ে যাচ্ছি।“ নিয়াজ একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, “বেজির দল আবার যদি এ্যাটাক করে, মনে হয় আর নিজেদের রক্ষা করতে পারব না।“

“কিন্তু চেষ্টা করতে হবে।“ জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলল, “আমরা এতক্ষণ যখন পেরেছি, বাকিটাও পারতে হবে।“

“কীভাবে পারবি ?“

“সেটাই চিন্তা করছি।“ জয়ন্ত দুর্বলভাবে হাসার চেষ্টা করে বলল, “আমাদের অস্ত্র হচ্ছে বন্দুক, পাইপগান, কিরিচ আর আগুন। কিন্তু সামরিকভাবে তার সমাধান করতে পারব মনে হয় না। সমাধানটা হতে হবে কূটনৈতিক !“

শ্রাবণী শব্দ করে হেসে বলল, “ভালোই বলেছিস।“

“না-না, আমি ঠাট্টা করছি না। আমি সিরিয়াসলি বলছি।“

“কিন্তু সেই কূটনৈতিক মিশনটা চালাবি কেমন করে ?“

“সেটাই ভাবছি। বেজিগুলো ম্যাচটা নেয়ার জন্যে খুব ব্যস্ত। সেটা দিয়ে একটা কম্প্রোমাইজ করা যেতে পারে। তুই বেজির ভাষা ব্যবহার করে দেখিয়েছিস যে তাদের সাথে ডায়ালগও করা যায়।“

“কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত মাত্র একটা শব্দ জানি, সেটা হচ্ছে ক্রিঁকি। এক শব্দ দিয়ে কূটনৈতিক আলাপ কেমন করে হয় ?“

“সেটাই হয়েছে মুশকিল।“ জয়ন্ত চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে বলল, “কথা দিয়ে যদি না পারি তাহলে কাজকর্ম দিয়ে করতে হবে। জেসচার দিয়ে করতে হবে।“

“কী হবে তোর সেই জেসচার ?“

জয়ন্ত কথা না বলে চুপ করে রইল এবং ঠিক তখন শ্রাবণী হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে, “ওটা কী ?“

শ্রাবণীর দৃষ্টি অনুসরণ করে সবাই টেবিলের নিচে তাকায়। মোমবাতির আলোয় দুটি চোখ জ্বলজ্বল করছে। জয়ন্ত বন্দুকটা হাতে নিয়ে বলল, “কী আবার হবে ? একটা ধুমসো বেজি।“

“এটা এখানে এসেছে কেন ?“

“এখনো জানিম না কেন আসে ?“

“হ্যাঁ জানি।“ শ্রাবণী চিন্তিত মুখে বলল, “কিন্তু যখন আসে তখন তো দল বেধে আসে। এখন একা এসেছে কেন ? কোন দিকে দিয়ে এসেছে ?“

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলল, “তুই কি ভেবেছিস আমরা ল্যাবরেটরি-ঘরটা পুরোপুরি সীল করতে পেরেছি ? পারি নাই। কত ফাঁকফোকর আছে। তার কোনো একটা দিয়ে ঢুকে গেছে।“

শ্রাবণী চিন্তিত মুখে বলল, “এমনভাবে বসে আছে যেন আমাদের সব কথা বুঝতে পারছে।“

“হ্যাঁ।“ জয়ন্ত বলল, “আমার ধারণা ব্যাটা স্পাইগিরি করতে এসেছে।“

নিয়াজ একটা লাঠি নিয়ে বলল, “দাঁড়া ব্যাটার স্পাইগিরি করা বের করছি।“

“কী করবি ?“

“পিটিয়ে ঘিলু বের করে দেব।“

আজ সারাদিনে তারা অসংখ্য বেজির ঘিলু পিটিয়ে বার করে দিয়েছে, শরীর থেঁতলে দিয়েছে, শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়েছে, পুড়িয়ে দিয়েছে। কাজেই নিয়াজের কথাটা অর্থহীন আস্ফালন নয়। তবে প্রতিবারই এই বীভৎস কাজগুলো করেছে নিজেদের বাঁচাতে গিয়ে। একসাথে যখন অসংখ্য বেজি তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন হাতের লাঠিটা ঘোরালেই কিছু বেজি তার আঘাতে থেঁতলে গেছে। তবে এটা ভিন্ন ব্যাপার - নিয়াজ নির্দিষ্ট একটা বেজিকে একটা উচিৎ শিক্ষা দেবার চেষ্টা করছে !

বেজি অত্যন্ত ধূর্ত প্রাণী। ল্যাবরেটরি-ঘরে টেবিলের নিচে ঘাপটি মেরে থাকা একটা বেজিকে নিয়াজ লাঠি দিয়ে কিছু একটা করে ফেলতে পারবে সেটা কেউই ভাবেনি। কিন্তু নিয়াজ হঠাৎ করে সেই অসাধ্য সাধন করে ফেলল। লাঠিটা দিয়ে খোঁটা মেরে বেজিটাকে দেয়ালের সাথে আটকে ফেলে চিৎকার করে বলল, “ধরেছি শালার ব্যাটাকে, যাবি কোথায় এখন? স্পাইগিরি করতে এসেছিস ?“

জয়ন্ত এবং শ্রাবণী এগিয়ে গেল। ধূসর রঙের বড়োসড়ো বেজিটা লাঠির চাপে আটকা পড়ে কাতর শব্দ করছে। নিয়াজ হিংস্র গলার বলল, “আরেকটা লাঠি দিয়ে এই জানোয়ারের বাচ্চার মাথাটা থেঁতলে দে দেখি। বোঝাই শালার ব্যাটাকে মজাটা !“

শ্রাবণী হঠাৎ উত্তেজিত গলায় বলল, “দাঁড়া, দাঁড়া, পাগলামি করিস না।“

“কী হয়েছে ?“

শ্রাবণী মোমবাতিটা নিয়ে আরেকটু কাছে গিয়ে বেজিটাকে ভালো করে লক্ষ করে বলল, “দেখছিস না এটা কোনো কথা বলার চেষ্টা করছে ?“

নিয়াজ এবং জয়ন্ত ভালো করে তাকাল, সত্যি সত্যি বেজিটা সামনের দুই পা-কে হাতের মতো নেড়ে কিছু-একটা বলার চেষ্টা করছে। তারা কান পেতে শোনার চেষ্টা করল, দেখল বেজিটা মাথা নেড়ে অবিকল মানুষের গলায় বলল, “সুসু সুসু।“

শ্রাবণী উত্তেজিত হয়ে বলল, “আরেকটা শব্দ শিখলাম। সুসু। সুসু মানে নিশ্চয়ই আমাকে মেরো না প্লিজ।“

জয়ন্ত মাথা নাড়ল, বলল, “ঠিকই বলেছিস।“ সে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে বলল, “দেখি এর সাথে কথাবার্তা চালানো যায় কি না।“

শ্রাবণী বলল, “দাঁড়া, উল্টাপাল্টা কিছু বলে এটাকে কনফিউজ করিস না।“

“কী করব তাহলে ?“

“যেহেতু এটা বলছে ছেড়ে দিতে, কাজেই এটাকে ছেড়ে দিতে হবে। এটা হচ্ছে ওদের কাছে নাইস জেসচার দেখানোর সুযোগ।“

নিয়াজ বলল, “ছেড়ে দেব ?“

শ্রাবণী বলল, “আগেই ছাড়িস না। কথা বলার চেষ্টা করে দেখি।“ সে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে বেজিটার দিকে তাকিয়ে বলল, “সুসু।“

হঠাৎ করে ম্যাজিকের মতো একটি ব্যাপার হল। বেজিটি এতক্ষণ ছটফট করে কাতর শব্দ করছিল, সবকিছু একমুহূর্তে থেমে গেল। বেজিটি প্রবল ঔৎসুক্য নিয়ে শ্রাবণীর দিকে তাকাল।

শ্রাবণী আবার বলল, “সুসু।“

নিম্নশ্রেনীর প্রাণীর চোখেমুখে আনন্দ বা দুঃখের ছাপ পড়ে না কিন্তু শ্রাবণীর স্পষ্ট মনে হল বেজিটির চোখমুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে গেছে। বেজিটি সামনের দুটি পা হাতের মতো নেড়ে নেড়ে বলল, “সুসু সুসু ...“

শ্রাবণী নিয়াজকে বলল, “বেজিটাকে ছেড়ে দে।“

“ছেড়ে দেব ?“

"হ্যাঁ।" শ্রাবণী লাঠিটা হাত দিয়ে সরিয়ে দিতেই বেজিটা মুক্ত হয়ে দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল, দৌড়ে পালিয়ে গেল না। শ্রাবণী চাপা গলায় বলল, "দেখেছিস, এটা আমাকে বিশ্বাস করেছে !"

"হ্যাঁ।" জয়ন্ত ফিসফিস করে বলল, "দ্যাখ বিশ্বাসটা পাকা করা যায় কি না।"

শ্রাবণী বলল, "সুসু সুসু ..."

বেজিটাও বলল, "সুসু সুসু ..."

শ্রাবণী চাপা গলায বলল, "একটা মোমবাতি আর ম্যাচটা দে।"

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি একটা মোমবাতি আর ম্যাচ এগিয়ে দিল। শ্রাবণী ম্যাচের বাক্স থেকে একটা ম্যাচের কাঠি বের করে বাক্সের পাশে ঘসে আগুন জ্বালাতেই বেজিটি বিচিত্র একটি ভয়ের শব্দ করে লাফিয়ে পিছনে সরে গেল। জয়ন্ত ফিসফিস করে বলল, "ভয় পেয়েছে।"

"কিন্তু পালিয়ে যায়নি। দূর থেকে দেখছে।"

শ্রাবণী নরম গলায় বলল, "সুসু সুসু ..." তারপর ম্যাচটি দিয়ে মোমবাতিটি জ্বালিয়ে দিল। বেজিটি তীক্ষ্ণচোখে সেটি দেখে খুব ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে এসে মোমবাতিতে আগুনের শিখাটি দেখে। এর আগে এত কাছে থেকে কোনো বেজি আগুনের শিখা দেখেনি। জয়ন্ত ফিসফিস করে বলল, "বুদ্ধিমত্তার প্রথম ব্যাপারটাই হচ্ছে কৌতুহল। বেজিটার কী কৌতুহল দেখেছিস !"

শ্রাবণী বলল, "বেজি সাহেব, তোমাকে আমি আগুন জ্বালানো শিখিয়েছি। এখন আগুন নেভানো শিখিয়ে দেই। এই দ্যাখো এভাবে আগুন নেভায় -" শ্রাবণী ফু দিয়ে মোমবাতিটি নিভিয়ে দিতেই বেজিটি চমকে একটু পিছনে সরে গেল। কিন্তু পালিয়ে গেল না।

জয়ন্ত খুশি-খুশি গলায় বলল, "কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রায় হয়েই গেছে - এবারে বেজিটাকে চলে যেতে দে।"

শ্রাবণী বলল, "যাওয়ার আগে কিছু-একটা উপহার দেওয়া যায় না ?"

"কী উপহার দিবি ?"

"ফুলের তোড়া আর মানপত্র।"

"ফাজলেমি করিস না। ম্যাচটা নেবার জন্যে পাগল কিন্তু সেটা এখন দেয়া যাবে না।"

"ঠিক আছে -" শ্রাবণী বলল, "এই মোমবাতিটা দিই।"

শ্রাবণী মোমবাতিটা বেজির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "সুসু।"

বেজিটা তার ছুঁচালো নাক দিয়ে মোমবাতিটা কয়েকবার শুঁকে সেটাকে কামড়ে ধরল। তারপর লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যেতে শুরু করল। জয়ন্ত বলল, "নিয়াজ দরজাটা খুলে দে। বেজিটাকে সসম্মানে যেতে দিই।"

নিয়াজ দরজাটা খুলে দিতেই মোমবাতিটা কামড়ে ধরে রেখে বেজিটা লাফিয়ে বের হয়ে গেল।

জব্বার মিয়া একটা কাতর শব্দ করতেই জয়ন্ত মোমবাতিটা হাতে নিয়ে তার কাছে এগিয়ে যায়। শরীরের নিচে রক্তে ভিজে গেছে। জয়ন্ত চিন্তিত মুখে বলল, "আবার ব্লিডিং শুরু হয়েছে।"

শ্রাবণী এগিয়ে গিয়ে বলল, "দেখি মোমবাতিটা ধর দেখি।"

জয়ন্ত মোমবাতিটা ধরল, শ্রাবণী একটা কাপড়েরর টুকরো দিয়ে জব্বার মিয়ার ক্ষতস্থান বেঁধে দেয়ার চেষ্টা করতে থাকে।

নিয়াজ আবার দেয়ালে হেলান দিয়ে বলল, "কেউ যদি আমাকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি দিত - আমি তাকে চোখ বুজে এক লাখ টাকা দিয়ে দিতাম।"

"মাত্র এক লাখ ?" শ্রাবণী বলল, "আমি দশ লাখ দিতাম।"

জয়ন্ত বলল, "কল্পনাতেই যখন দিবি বেশি করে দে। টাকায় না দিয়ে ডলারে দে।"

"ঠিক আছে তাই সই। এক মিলিয়ন ডলার দিতাম।"

"তোরা এমনভাবে কথা বলছিস যেন সবাই এক একজন বিল গেটস।"

"ভৈরবের ফেরিতে ছোট ছোট বাচ্চারা পানি বিক্রি করে, এক গ্লাস পানি এক টাকা ! এখন মনে হচ্ছে বিল গেটস না হয়ে ঐ পানিওয়ালা বাচ্চা হলেই ভালো হত - ঢক ঢক করে পুরো কলসি পানি খেয়ে ফেলতাম।"

জয়ন্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, বলল, "হ্যাঁ এভাবে আর থাকা যাচ্ছে না। আয় বের হই।"

"বের হব ?" শ্রাবণী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জয়ন্তের দিকে তাকাল, "তুই সিরিয়াস ?"

"হ্যাঁ। যদি আক্রমন করতে চায় বলব সুসু সুসু ..."

"তারপরও যদি আক্রমন করে ?"

"তাহলে কিছু করার নেই। বন্দুক দিয়ে গুলি করে কিরিচ দিয়ে কুপিয়ে আগুন ধরিয়ে কোনোভাবে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করব।"

শ্রাবণী দুর্বলভাবে হেসে বলল, "একেকজনের কী দশা হয়েছে দেখেছিস ?"

"যখন এনার্জি পাবি না তখনই চিন্তা করবি ট্রলার পর্যন্ত পৌঁছলেই বোতল ভরা ঠাণ্ডা পানি! সাথে সাথে শরীরে এড্রনালিনের ফ্লো শুরু হয়ে যাবে।"

নিয়াজ বলল, "সমস্যা শুধু জব্বার মিয়াকে নিয়ে।"

জব্বার মিয়া সাথে সাথে চোখ খুলে বলল, "আমাকে নিয়ে চিন্তা করবেন না। আপনারা যদি পারেন, আমিও পারব।"

"ঠিক আছে, তবে রওনা দিই। ওঠো সবাই।"

জব্বার মিয়া খুব ধীরে ধীরে বসল। তারপর জয়ন্তের হাত ধরে সাবধানে উঠে দাঁড়াল। জয়ন্ত উৎসাহ দিয়ে বলল, "চমৎকার !"

ছোট দলটা রওনা দেয়ার প্রস্তুতি নিল। শ্রাবণীর হাতে বন্দুক, নিয়াজের হাতে পাইপগান, জয়ন্তের হাতে কিরিচ। সবার হাতেই একটা করে লাঠি এবং মশাল। সলভেন্টের বড় বোতল সাথে আছে, প্রয়োজন হলে ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়া যাবে।

শ্রাবণী বলল, "বাইরে অন্ধকার, মোমবাতি জ্বালিয়ে নিই ?"

জব্বার মিয়া বলল, "চাঁদনী রাত আছে। মোমবাতি জ্বালালে দূরে কিছু দেখবেন না। তাছাড়া বাতাসে নিভে যাবে।"

জয়ন্ত বলল, "হ্যাঁ, জব্বার মিয়া ঠিকই বলেছে। বাসা থেকে বের হবার সময়ই মোমবাতি নিভিয়ে নেব। ভালো জোছনা হলে পরিষ্কার দেখা যায়।"

দলটি দরজা খুলে ধীরে ধীরে বের হল। করিডোর ধরে হেঁটে সিঁড়ির সামনে দাঁড়াল। ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে সাবধানে নেমে এল। বাইরের দরজা খুলে বারান্দায় বের হয়ে আসে। জব্বার মিয়া ঠিকই বলেছে, আকাশে মস্তবড় চাঁদ। শহরে তারা কখনো আমাবস্যা পূর্নিমার খবর রাখে না - আকাশে চাঁদটি ওঠে, অপরাধীর মতো ডুবেও যায় অপরাধীর মতো। অথচ এখানে চাঁদটি কী ভয়ঙ্কর অহঙ্কারীর মতো পুরো আকাশটিকে উজ্জ্বল করে রেখেছে।

জয়ন্ত ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটি নিভিয়ে দিতেই হঠাৎ করে জোছনার আলোতে চারিদিকে প্লাবিত হয়ে গেল। মনে হচ্ছে পুরো এলাকাটি বুঝি জোছনার আলোতে উথালপাথাল করছে। শ্রাবণী নিশ্বাস ফেলে বলল, “ইশ ! কী সুন্দর।“

জয়ন্ত বলল, “আসলেই।“

“যদি একটু পরে মরে যাই তোরা কোনো দাবি রাখিস না।“

কেউ কোনো কথা বলল না, এই সুন্দর পরিবেশে ভয়ঙ্কর বীভৎস একটা মৃত্যুর কথা কেউ চিন্তা করতে পারছে না। শুধু জব্বার মিয়া নিচু গলায় বলল, “আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখেন। হায়াত মউত আল্লাহর হাতে।“

জয়ন্ত বলল, “আয় রওনা দিই।“

চারজনের ছোট দলটি নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে পথে নেমে এল। সুড়কি বিছানো পথে তারা খুব সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে যায়। সামনে বড় বড় গাছ ঝোপঝাড় তার নিচে হাজার হাজার বেজি নিঃশব্দে বসে আছে, তারা জানে বেজিগুলো তীক্ষ্ণচোখে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

শ্রাবণীর হৃৎপিণ্ড বুকের মাঝে ধকধক করে শব্দ করছে, প্রতিমুহূর্তে মনে হতে থাকে বেজিগুলো বুঝি তাদের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সবার আগে শ্রাবণী, তার পেছনে জব্বার মিয়া, জব্বার মিয়াকে দুইপাশ থেকে নিয়াজ আর জয়ন্ত ধরে রেখেছে।

কাঁপা-কাঁপা পা ফেলে শ্রাবণী আরো একটু এগিয়ে এল। এখন বেজিগুলোর খুব কাছাকাছি চলে এসেছে - এত কাছে যে প্রতিবার পা ফেলার আগে তাকে লক্ষ্য করতে হচ্ছে সে কোথায় পা ফেলছে, কোনো বেজির উপর পা ফেলে দিচ্ছে কি না। জোছনার আলোতে চারদিক থই থই করছে, তার মাঝে বড় বড় গাছের ছায়া। জোছনার নরম আলোতে সবকিছু দেখা যায় কিন্তু কিছু স্পষ্ট বোঝা যায় না। গাছের নিচে ঝোপের আড়ালে বেজিগুলো বসে আছে অনুভব করা যায়, কিন্তু ঠিক ভালো করে দেখা যায় না। নিশ্বাস বন্ধ করে শ্রাবণী আরো কয়েক পা এগিয়ে গেল। তার মনে হলো হঠাৎ করে সামনে একটা বড় গাছের নিচে কিছু-একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। হিংস্র শব্দ করে কিছু বেজি নড়তে শুরু করেছে। আতঙ্কে শ্রাবণীর হৃৎপিণ্ড থেমে আসতে চায় - সে কাঁপা গলায় বলল, “সুসু-সুসু ...“

সাথে সাথে সবকিছু যেন স্থির হয়ে যায়, নিঃশব্দ হয়ে যায়। বিস্তীর্ণ এলাকায় হিংস্র-চোখে বসে থাকা বেজিগুলো হঠাৎ যে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। অনভ্যস্ত হাতে শক্ত করে ধরে রাখা বন্দুকটা নিয়ে শ্রাবণী আবার বলল, "সুসু-সুসু ..."

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে আবার উচ্চকণ্ঠে বলল, "সুসু-সুসু ..."

হঠাৎ করে প্রতিধ্বনির মতো কথাগুলো ফিরে আসতে শুরু করে। মনে হয় সমস্ত বনাঞ্চল যেন প্রতিধ্বনি করে উঠে, "সুসু-সুসু ..."

জয়ন্ত কাঁপা গলায় বলল, "কমিউনিকেট করা গেছে। মনে হয় বেঁচে গেলাম।"

"এখনো জানি না।" শ্রাবণী বলল, "হাঁটতে থাক।"

চারজনের ছোট দলটা দ্রুত হাঁটতে শুরু করে। হাতে করে রাখা সলভেন্টের ভারী বোতলগুলো ঠেলে নেয়া কষ্টকর হতে থাকে। তারা তখন একটা একটা করে ফেলে দিয়ে আসতে থাকে। তাদের ডানে বায়ে সামনে পিছনে বেজি। ধূসর বেজিগুলো সরে গিয়ে তাদের জায়গা করে দিচ্ছে, তারা সে জায়গায় পা ফেলে এগিয়ে যেতে থাকে। একটু পরপর তার দাঁড়িয়ে পড়ে চাপা গলায় বলছে, "সুসু-সুস ..." যার অর্থ "আমাদের মেরে ফেলো না প্লিজ !" তার প্রত্যুত্তরে বেজিগুলোও বলছে, "সুসু-সুসু -।" পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রজাতির কাছে সেটাও যেন অবোধ প্রাণীগুলোর একধরনের আকুতি।

জোছনার নরম আলোতে পা ফেলে ফেলে হাজার হাজার বেজিকে পিছনে ফেলে তারা শেষপর্যন্ত বালুবেলায় চলে এল। বালুবেলার নরম বালুতে পা ফেলে তারা এগিয়ে যায়। এই তো সামনে আর কিছুদূরে ট্রলারটি সমুদ্রের ঢেউয়ে দুলে দুলে উঠছে। আর কয়েকপা এগিয়ে গেলে তারা বেঁচে যাবে - ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্ন থেকে তারা রক্ষা পেয়ে যাবে।

ঠিক তখন জয়ন্ত দাঁড়িয়ে গেল। নিয়াজ বিরক্ত হয়ে বলল, "কী হল ?"

"তোরা যা আমি আসছি।"

নিয়াজ অবাক হয়ে বলল, "কোথা থেকে আসছিস ?"

"বেজিগুলোর কাছ থেকে।"

"বিদায় নিয়ে আসবি ?" নিয়াজ খেপে গিয়ে বলল, "গালে চুমু দিয়ে বিদায় নিয়ে আসবি ?"

"না, একটা জিনিস দিয়ে আসব।"

"কী জিনিস ?"

“ম্যাচটা। মনে নেই ম্যাচটার জন্যে কী করল ?“

নিয়াজ রেগে বলল, “দ্যাখ জয়ন্ত পাগলামি করিস না। তোর একগুঁয়েমির জন্যে আমরা সবাই মরতে বসেছিলাম। এখন আবার একগুঁয়েমি করে ফেরত যাচ্ছিস ? ফাজলেমির একটা সীমা থাকা দরকার।“

জয়ন্ত বলল, “তোদের যা ইচ্ছে বলতে পারিস। এই বেজিগুলো হচ্ছে মানুষের বুদ্ধিমত্তার একটা অংশ - তাদের বুদ্ধিমত্তাকে সম্মান করতে হবে। তোরা যা, আমি ম্যাচটা দিয়েই চলে আসব। বুদ্ধিমত্তার প্রথম স্টেপ হচ্ছে আগুন। ওদেরকে আগুন জ্বালানোর একটা সুযোগ করে দিই।“

নিয়াজ ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, “ঢং করার জায়গা পাচ্ছিস না ? এটা একটা ঢং করার ব্যাপার হল? ন্যাকামো হল ?“

“হোক।“ জয়ন্ত পাথরের মত মুখ করে বলল, “তোরা যা।“

শ্রাবণী, নিয়াজ এবং জব্বার মিয়া হতবুদ্ধি হয়ে দেখল, জয়ন্ত আবার গভীর অরণ্যের মাঝে ঢুকে যাচ্ছে। মানুষের বুদ্ধিমত্তার একটি অংশ বহন করছে যে-প্রাণী সেই প্রাণীর তীব্র কৌতুহলকে সম্মান না-দেখিয়ে সে ফিরে যেতে পারবে না।

জোছনার নরম আলোয় জয়ন্তের অপসৃয়মান দেহটিকে একটি অতিপ্রাকৃত প্রতিমূর্তির মতো মনে হতে থাকে।

॥ আট ॥

চাঁদের আলোতে সমুদ্রের পানি কেমন জানি ঝিকমিক করছে। তার মাঝে চাপা শব্দ করে ট্রলারটি এগিয়ে যাচ্ছে। নিয়াজ অনভ্যস্ত হাতে ট্রলারের হালটি ধরে রেখেছে, সে কল্পনাও করতে পারে না দুদিন আগে ট্রলারের উপর বসে থাকা নিয়ে তার ভেতরে একধরনের আতঙ্ক ছিল অথচ এখন সে এটি সমুদ্রের ওপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ট্রলারের ভেতরে জব্বার মিয়া লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। তার দুর্বল দেহে চেতনা আসছে এবং চলে যাচ্ছে। ট্রলারটি সোজা দক্ষিণে গেলে লোকালয় পাওয়া যাবে, সেখান থেকে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। জব্বার মিয়া ভয় পায় না - সমুদ্রের বুকে সে এর থেকে অনেক বড় দুর্ঘটনাও পার হয়ে এসেছে। মৃত্যু বারবার আসে না - একবারই আসে এবং সত্যি সত্যি যখন আসবে সে একটুও ভয় না-পেয়ে তার মুখোমুখি হবে।

চাঁদটি এখন ঠিক মাথার ওপরে। পিছনে হকুনদিয়া দ্বীপ। জোছনার নরম আলোতে এত দূর থেকে হকুনদিয়া দ্বীপটি দেখা পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু সেটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কারণ পুরো দ্বীপটি দাউদাউ করে জ্বলছে। আগুনের কমলা রঙের শিখা জীবন্ত প্রাণীর মতো লকলক করে নাচছে। সমস্ত আকাশ সেই আগুনের আলোতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

ট্রলারের ছাদে হাত রেখে শ্রাবণী দাঁড়িয়ে ছিল। সে জয়ন্তের হাত স্পর্শ করে বলল, “মন খারাপ করিস না জয়ন্ত।“

জয়ন্ত কাঁপা গলায় বলল, “আমি দায়ী। আমি যদি ম্যাচটা না দিয়ে আসতাম -“।

শ্রাবণী নিচু গলায় জোর দিয়ে বলল, “না, তুই দায়ী না। এই বেজিগুলো প্রকৃতির স্বাভাবিক সৃষ্টি না। এটা মানুষের তৈরি একটি কৃত্রিম সৃষ্টি। যেটা স্বাভাবিক না সেটা প্রকৃতিতে থাকে না, থাকতে পারে না।“

“কিন্তু আমি যদি ম্যাচটি না দিয়ে আসতাম তাহলে এতবড় আগুন লাগত না।“

“তোর ধারণা কাজটি ভুল হয়েছিল ?“

“অবশ্যই ভুল হয়েছিল।“

“একটা ভুলের জন্যে যে প্রাণী সারা পৃথিবী থেকে শেষ হয়ে যায় সেই প্রাণীর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কথা না।“

“কিন্তু -“

“না জয়ন্ত। এই বেজিগুলো ছিল একটা ভয়ঙ্কর ভুল। তোর আরেকটা ভুল দিয়ে সেই ভুলটি সংশোধন করা হল।“

জয়ন্ত কোনো কথা না বলে দূরে হকুনদিয়া দ্বীপের দিকে তাকিয়ে রইল। আগুনের লাল আভায় টুরো আকাশটি আলোকিত হয়ে আছে। ভয়ঙ্কর আগুনের মাঝে বেজিগুলো না-জানি কী ভায়ায় চিৎকার করে আর্তনাদ করছে।

॥ সমাপ্ত ॥